তে, লিউ সো পেঙ, লিন পিয়াঙ, পেঙতে হুয়াই প্রভৃতি নেতার নেতৃত্বে এই লংমার্চ সংঘটিত হয়েছিল। এই পদযাত্রা শুরু হয় কিয়াংসি প্রদেশ থেকে এবং পরিসমাপ্ত হয় পীত লদীর বাঁকে অবস্থিত শেনসি প্রদেশে। এই পদযাত্রায় সাম্যবাদীরা ৬ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করেন। পদযাত্রীদের মধ্যে মাত্র ৮ হাজার গন্তব্য স্থানে সশরীরে উপনীত হতে সক্ষম হলেন। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কম্যুনিস্টরা ইয়েনানে তাদের প্রধান কার্যালয় সরিয়ে নিয়ে গেলেন। লং মার্চের সময় আঠারোটি গিরিশ্রেণি এবং চব্বিশটি নদী অতিক্রম করেছিলেন। পথে নানা ধরণের দুর্যোগ দুর্বিপাক এবং চিয়াংয়ের সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে অনেকেই প্রাণ হারিয়েছিলেন। কিন্তু এই অভূতপূর্ব এবং অসম বাঁচার লড়াইয়ে যাঁরা টিকতে পেরেছিলেন তাদের নিয়ে ইয়েনানে মাও রুশ প্রভাব মুক্ত একটি পার্টি ও সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। এইভাবে মস্কোর বিরোধিতা সত্বেও লংমার্চের বিপজ্জালের মধ্যে মাও নিজেকে চীনা কম্যুনিস্ট আন্দোলনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু ১৯৩৮ সালের আগে মস্কো তাঁর এই সম্মানকে স্বীকার করে নেয়নি। বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণিভুক্ত কর্মীবাহিনীর কর্মকুশলতা, পদযাত্রীদের মনোবল, মানসিক দৃঢ়তা, সহনশীলতা এবং সর্বোপরি বৈপ্লবিক অনুপ্রেরণা লং মার্চের সাফল্য সুনিশ্চিত করেছিল। এর ফলে চীনের সুবিস্তৃত অঞ্চলের উপর সাম্যবাদী প্রভাব বিস্তৃত হল। এরপর আর মস্কোর পক্ষে সি.সি.পি.-তে মাও সে তুং-এর নেতৃত্বকে যথাযথ স্বীকৃতি জানানো ছাড়া উপায় ছিল না।

১০.১.১৫ জাপান-বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রাম ও কম্যুনিস্ট-কুয়োমিনতাং দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট

১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ফ্যাসিবাদের বিপদ সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। ইটালিতে মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদের, জার্মানিতে হিটলারের নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট নাৎসী দলের এবং জাপানে তোজোর নেতৃত্বে উগ্র জাতীয়তাবাদের উত্থান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকের নেতা হিসাবে সোভিয়েত কর্ণধার স্তালিন অত্যন্ত সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে মতাদর্শগত দিক দিয়ে ফ্যাসিবাদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু কম্যুনিস্টরা। তাই ১৯৩৫ সালের আগস্ট মাসে কমিন্টার্ন সমস্ত দেশের কম্যুনিস্ট পার্টিকে সেই দেশের অন্যান্য বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দলগুলির সাথে হাত মিলিয়ে 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট' (Anti-Fascist United Front) গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। এই আহ্বানে সাড়া দিতে মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বাধীন চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির কোন কুণ্ঠা ছিল না। বস্তুতপক্ষে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকেই মাও জাপানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দল এবং সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা স্থাপন করেছিলেন। কারণ, যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠলে চিয়াং-এর কম্যুনিস্ট উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ থাকবে এবং সেই সুযোগে চীনে কম্যুনিস্ট পার্টির শক্তিবৃদ্ধি করা সহজ হবে।

১৯৩৫ সালের শেষের দিক থেকেই চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি কম্যুনিস্ট বিরোধী অভিযান বন্ধ রেখে জাপানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলার বিষয়ে চীনে জনমত গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়। চীনে সেই সময় জাপ-বিরোধী জাতীয় চেতনার একটি জোয়ার দেখা দিয়েছিল. চীনের ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা চিয়াং কাই শেককে কম্যুনিস্টদের বদলে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু চিয়াং কাই শেকের নানকিং সরকার তখন চীনা সাম্যবাদীদের উচ্ছেদ সাধনে কৃতসংকল্প ছিল। চীনের ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের চাপ সত্ত্বেও চিয়াং উগ্র কম্যুনিস্ট বিরোধিতা পরিত্যাগ না করে জনপ্রিয়তা হারালেন। চিয়াং মনে করতেন যে জাপানিদের চেয়েও সাম্যবাদীরা বেশি বিপজ্জনক, তাই তারাই পয়লা নম্বরের শত্রু। জাপানও

সাম্যবাদ বিরোধী তাই দেশের আভ্যন্তরীণ শত্রু কম্যুনিস্টদের দমন করে তবে বিদেশি শত্রু জাপানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া সমীচীন। ফলে ১৯৩৫ সালের শেষদিকে জাপান যখন আবার উত্তর চীন আক্রমণ করল তখন এই আক্রমণ রোধ করতে চিয়াং খুব সক্রিয় ভূমিকা নিলেন না। জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতি এবং চিয়াং সরকারের নিষ্ক্রিয়তা চীনের বিভিন্ন স্থানে জঙ্গী ছাত্র আন্দোলনের জন্ম দিল। এর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল পিকিং।

কিন্তু চিয়াং তাঁর কম্যুনিস্ট বিরোধিতায় অটল থাকেন এবং যেহেতু লংমার্চের পর কম্যুনিস্টরা চীনের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন সেহেতু চিয়াং উত্তর চীনে চ্যাং সুয়ে লিয়াং এবং ইয়াং হু চেং এর অধিনায়কত্বে সৈন্য প্রেরণ করলেন। এইভাবে উত্তর চীনে একই সঙ্গে সাম্যবাদী, কে.এম.টি. এবং জাপানি সৈন্যের সহ অবস্থান জটিলতার সৃষ্টিকরল। কারণ সাম্যবাদীদের চাপ সত্ত্বেও চিয়াং কোনোমতেই জাপানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে চাইলেন না।

কিন্তু মাও, চু-তে, চৌ এন লাই প্রমুখ নেতারা চিয়াং-এর এই মানসিকতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তবুও তাঁরা ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে চিয়াং-এর সঙ্গে মিলিতভাবে একটি গণতান্ত্রিক সংযুক্ত ফ্রন্ট (Democratic United Front) গঠনের প্রস্তাব করেন। মাও ছিলেন তখনকার চীনা কেন্দ্রীয় সোভিয়েত সরকারের (Chinese Central Soviet Government) চেয়ারম্যান। এই পদাধিকার বলে মাও চিয়াংকে এই প্রস্তাব দিলেন—প্রথমত, বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করা, দ্বিতীয়ত, জনগণকে অধিকার দেওয়া, তৃতীয়ত, দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন, চতুর্থত, কৃষকদের অতি অবশ্যই সাহায্য দান করতে হবে, পঞ্চমত, পুঁজিবাদের বিরোধিতা না করে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করতে হবে। এখানে বলা দরকার যে মাও সাময়িকভাবে পুঁজিবাদের বিরোধিতা না করার কৌশল নিয়েছিলেন। কারণ, পুঁজিবাদী চিয়াং ছাড়া জাপানি সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করা যেত না। এরপর মাও পুঁজিবাদী চিয়াংকে পরাস্ত করার কথা ভেবেছিলেন। তৎকালীন পরিস্থিতিতে মাও-এর এই নীতি ছিল অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত।

তবে, চিয়াং যে মাও-এর প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন তার কারণ ছিল ভিন্ন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে চ্যাং সুয়ে লিয়াং এবং ইয়াং হু চেং নামে দুজন কুয়োমিনতাং সেনানায়ককে তিনি উত্তর-পশ্চিমে কম্যুনিস্টদের সম্পূর্ণভাবে দমন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই অভিযান আদৌ সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। তাছাড়া, সৈন্যরা বিরামবিহীন গৃহযুদ্ধের ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। চ্যাং ও ইয়াং—এই দুই সেনানায়কসহ কে.এম.টি সৈন্যরা কম্যুনিস্ট প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা কম্যুনিস্টদের সাথে যোগ দিয়ে যৌথভাবে জাপানি আক্রমণ রোধ করতে চাইলেন। কিন্তু চিয়াং সৈন্যবাহিনীকে কম্যুনিস্ট দমনে উৎসাহিত করার জন্য ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর সিয়ানে এসে উপস্থিত হলেন। তখন আকস্মিকভাবে সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দিল। চ্যাং সুয়ে লিয়াং এবং ইয়াং হু চেং-এর হাতে চিয়াং বন্দী হলেন। এই দুই সেনানায়ক ৮ দফা শর্ত সম্বলিত একটি "জাতীয় ইস্তাহার" (National Manifesto) প্রকাশ করলেন। তাতে চিয়াংকে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করে কম্যুনিস্টদের সাথে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলে জাপান-বিরোধী লড়াই চালাতে বলা হল। কম্যুনিস্ট নেতা চৌ এন লাই-এর প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে কম্যুনিস্ট-কে.এম.টি. যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এর ফলে কম্যুনিস্ট-কে.এম.টি. গৃহযুদ্ধে ছেদ পড়ে এবং জাপান-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গড়ে ওঠার রাস্তা পরিস্কার হল। ১৯৩৬ সালের ২৫ ডিসেম্বর চিয়াংকে মুক্তিদান করা হল।

১০.১.১৬ সাম্যবাদী আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায় (১৯৩৭-৪৫) : ইয়েনান কাল

(ক) ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুলাই জাপান নতুন উদ্যমে চীনের লুকাও চিয়াও অঞ্চল আক্রমণ করল। কিছুদিন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলার পর জাপানি সেনারা পিকিং-এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দখল করে নিল। ১৩ আগস্ট জাপানের স্থল ও নৌবাহিনী যৌথভাবে সাংহাই আক্রমণ করল। জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণের এই ঘটনা অঘোষিত যুদ্ধ নামে পরিচিত। দুর্ভাগ্যবশত, চিয়াং-এর নেতৃত্বে কে.এম.টি বাহিনী জাপানকে প্রতিরোধ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। অথচ কম্যুনিস্ট পরিচালিত লালফৌজ, যা পরিচিত হয়েছিল 'এইট্‌থ্ রুট আর্মি এবং 'নিউ ফোর্থ আর্মি' নামে, তা উত্তর ও মধ্য চীনে সাফল্য লাভ করেছিল। এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে জনসাধারণ কম্যুনিস্টদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল। গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করে কম্যুনিস্ট নেতৃত্বাধীন বাহিনা জাপানি অধিকৃত এলাকার আশেপাশে শেন্ সি, চাহার হেপেই, সুইউয়ান, শানটুং, হেনান, আন্‌হুই এবং কিয়াংসি প্রদেশে গণতান্ত্রিক ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল। এই সমস্ত ঘাঁটিগুলিতে কম্যুনিস্ট নেতৃত্বে জাপান বিরোধী জনপ্রিয় শাসনতান্ত্রিক সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছিল। এখানে কৃষকদের ওপর থেকে করের বোঝা হ্রাস করা হয়েছিল এবং সুদের হার কমানো হয়েছিল, যার ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছিল। চীনা জনগণ জাপানি জঙ্গীদের বিরুদ্ধে কি কৌশল অবলম্বন করবে সেই মর্মে "দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ" (On Protracted War) নামে একটি পুস্তিকা ১৯৩৮ সালে রচনা করেছিলেন। এতে বলা হয়েছিল যে যেহেতু উন্নত সামরিক সরঞ্জামের অধিকারী জাপান চীনে তার সর্বশক্তি নিযুক্ত করেছে সেহেতু চীনকে এক দীর্ঘমেয়াদী ও কষ্টসাধ্য যুদ্ধ করতে হবে, অন্তত ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না অন্যান্য দেশ এসে চীনকে সহায়তা করে। ইয়েনানে অনুষ্ঠিত চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির (C.C.P.) ষষ্ঠ অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল মাও নির্দেশিত সমর কৌশল অনুসরণ করা হবে। এতে যে কম্যুনিস্টরা সফল হয়েছিল তার প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে জাপান কে.এম.টি.-র ওপর আক্রমণ বন্ধ রেখে কম্যুনিস্ট বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাতে থাকে। এই কঠিন সংগ্রামময় দিনে স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীন রাশিয়া ১৯৩৯ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত উদার হাতে চীনকে আর্থিক সাহায্য ও ঋণ দিয়েছিল। কম্যুনিস্টদের সাফল্য পাশ্চাত্য শক্তিদেরও নাড়া দিয়েছিল। চীন-জাপান যুদ্ধের সূচনাকালে ব্রিটেন ও আমেরিকা নিষ্ক্রিয় ছিল। কিন্তু কম্যুনিস্টরা ক্রমাগত সাফল্য পাওয়ায় ব্রিটেন ও আমেরিকা যুদ্ধ বন্ধ করতে আবেদন জানাল। কে.এম.টি. তো জাপানের কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য উন্মুখ ছিল। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানির পোল্যান্ড আক্রমণের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল। ঐ বছরের শীতকাল এবং ১৯৪০ -এর বসন্তকালে কে.এম.টি. বাহিনী যুক্তফ্রন্টের নীতি লঙ্ঘন করে শেন সি অঞ্চলের গণতান্ত্রিক ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করল। কম্যুনিস্ট বাহিনী সাফল্যের সাথে কে.এম.টি. আক্রমণ প্রতিহত করে জনমানসে আরো উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তুলল। কিন্তু কে.এম.টি. বাহিনী ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার অভিযান চালাতে শুরু করল। প্রচুর লোকক্ষয়ের বিনিময়ে 'নিউ ফোর্থ আর্মি' এই আক্রমণ প্রতিহত করল। কম্যুনিস্ট সেনাপতি ইয়েতনি আনগুইতে কে.এম.টি. নেতাদের সাথে কথাবার্তা চালাতে গেলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল, এই ঘটনা দক্ষিণ আনহুই-এর ঘটনা নামে খ্যাত। এরপর নানকিং সরকার, চিয়াং কাই শেকের বাহিনী এবং জাপানি বাহিনী মধ্য চীনের বিভিন্ন জায়গায় কম্যুনিস্টদের বিপর্যস্ত করে তুলল। সি.সি.পি.-র কেন্দ্রীয় কমিটির মিলিটারি কমিশন 'নিউ ফোর্থ আর্মি'কে সাতটি পৃথক ডিভিশনে ভাগ করেছিল। গণতান্ত্রিক ঘাঁটিগুলির সাধারণ মানুষরাও

এই যৌথ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সংগঠিত হল। কম্যুনিস্ট বাহিনীর কাছে পরাস্ত হয়ে চিয়াং জনগণের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন।

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে হিটলারের নাৎসী বাহিনী সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করল। এই ঘটনায় উৎসাহিত হয়ে জাপান ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের শেষার্ধ এবং গোটা ১৯৪২ সাল ধরে চীনের গণতান্ত্রিক ঘাঁটিগুলির বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর তাণ্ডবলীলা চালাল। জাপানি আগ্রাসনের তীব্রতা গণতান্ত্রিক ঘাঁটিগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছিল। এই কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য সি.সি.পি.-র সঠিক নেতৃত্ব ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এই প্রতিকূল পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠেছিল। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন সোভিয়েট লাল ফৌজ নাৎসী বাহিনীকে চূড়ান্ত পরাজিত করল তখন জাপানের মনোবল হ্রাস পেল। এই সুযোগে কম্যুনিস্ট বাহিনী জাপানি অধিকৃত গণতান্ত্রিক ঘাঁটিগুলি পুনরায় দখল করে মুক্তাঞ্চলগুলির সীমানা বাড়িয়ে নিল। এই সময় কে.এম.টি. বাহিনী তৃতীয় বার কম্যুনিস্ট বিরোধী আক্রমণ চালাল। এবার তাদের লক্ষ্য ছিল সি.সি.পি.র প্রধান কার্যালয় ইয়েনান। এবার কম্যুনিস্ট সৈন্যদলের সাথে গণতান্ত্রিক এলাকাগুলির সাধারণ মানুষরাও প্রতিরোধে সামিল হলেন। এইভাবে কম্যুনিস্টদের সংগ্রাম একটি জনযুদ্ধের রূপ নিল। কে.এম.টি. আক্রমণ সমগ্র চীনের জনমতকে সজাগ করে দিয়েছিল। চিয়াং ও তাঁর কে.এম.টি. দলের জনপ্রিয়তা একেবারেই হ্রাস পেয়েছিল।

(খ) ইয়েনান—একটি নতুন চীনা সমাজ : জাপানি এবং কে.এম.টি. যৌথ আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাসে মাও তাঁর বিখ্যাত তাত্ত্বিক প্রবন্ধ "On New Democracy" রচনা করেছিলেন। এই প্রবন্ধে মাও চীনের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল এই যে চীন হল একটি আধা উপনিবেশিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশ। এখানে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র ও তাদের সহযোগী শক্তিগুলি হল জনসাধারণের শত্রু। তাই শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির মতো কেবল শ্রমিক শ্রেণির অংশগ্রহণ বিপ্লবকে সফল করতে পারে না। এখানে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী যেমন, শ্রমিক শ্রেণি, দরিদ্র ও মধ্য কৃষক শ্রেণি, বুদ্ধিজীবী ও পেটি বুর্জোয়া শ্রেণি ও জাতীয় পুঁজিপতি শ্রেণি ঐক্যবদ্ধভাবে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রাম গড়ে তুলে বিপ্লব সফল করবে। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র ধ্বংস হবে, সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে উঠবে নয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। যেখানে পুঁজিপতি-শ্রমিক কোন বিভেদ থাকবে না। বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও সোভিয়েত গণতন্ত্র উভয়ের থেকেই এই নতুন গণতন্ত্র পৃথক। কারণ, এখানে পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ থাকবে না। আবার সর্বহারার একনায়কত্বের (Dictatorship of the Proletariat) পরিবর্তে এখানে প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী ও পুঁজিপতি শ্রেণির একনায়কতন্ত্র। এইভাবে মাও বিপ্লবের পরবর্তী স্তরে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের আদর্শে চীনে কিভাবে একটি নতুন সমাজ গড়ে উঠবে, তার রূপরেখা অঙ্কন করেছিলেন। এই রূপরেখা শুধু চীনে নয়, বিভিন্ন আধা ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিপ্লবের মডেল হিসাবে কাজ করেছিল। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইয়েনানকে কেন্দ্র করে সি.সি.পি. একদিকে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়েছিল অন্যদিকে একটি নতুন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। ইয়েনান ছিল কৃষকদের কর্মকাণ্ডের প্রধান স্নায়ুকেন্দ্র। অন্যদিকে সাংহাই ছিল চীনের শ্রমিক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। জাঁ শ্যেনো বলেছেন যে ইয়েনান ছিল একটি স্নায়ুকেন্দ্র যা একটি অসম্ভব সফল সামরিক সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল, আবার এটি ছিল নতুন সামাজিক ও মানবিক সম্পর্কের প্রতীক একটি মডেল।

বস্তুত মাও যুদ্ধকালীন অবস্থার সুযোগ নিয়ে সাম্যবাদী দল ও সাম্যবাদী সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন করেন এবং জনগণকে সাম্যবাদী মন্ত্রে দীক্ষিত করে সাম্যবাদী বিপ্লবের জন্য সংগঠিত করেন। চীনের কৃষিভিত্তিক সমাজ ও অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ প্রচারে তৎপর হন। তাঁর বিশেষ কার্যক্রম ছিল গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। কিন্তু মস্কোপন্থী লি লি সান, ওয়াং মিং, পো কু প্রমুখ মাও-এর পথ সমর্থন করতেন না। তাঁরা শহরাঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণির অংশগ্রহণকে অধিকতর গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু মাও লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে কৃষক সম্প্রদায়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করেন ও কৃষককুলকে নিয়ে বিপ্লবী সেনাদল গঠনে অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি তাদের নিয়ে কৃষি মজদুর ইউনিয়ন গঠন করেছিলেন। কৃষকেরা যাতে জমি উপগ্রহণ ও পুনর্বন্টন আন্দোলনে যোগদান করে তজ্জন্য তাদের উৎসাহিত করেছিলেন। এর ফলে কৃষক সম্প্রদায় আত্মসচেতন হয় এবং ঐতিহ্যগত ভীরুতা ত্যাগ করে সংগ্রামের পথে পা বাড়ায়। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ১৬ বছর বা ততোধিক বয়স্ক কৃষকেরা কেন্দ্রস্থানীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে সংযুক্ত হলেন। মাও বিশ্বাস করতেন যে সকল শ্রেণির চীনা অধিবাসীই নতুন চীন সংগঠনে এগিয়ে আসতে পারে এবং রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই তিনি 'সান সান চি' পদ্ধতি (Three-Thirds System) প্রবর্তন করেন। এই পদ্ধতি অনুসারে দলীয় সভ্যেরা প্রশাসনে এবং পরিষদ সমূহে মোট সভ্যপদের এক-তৃতীয়াংশের অধিকারী হবেন; অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ সভ্য নির্বাচিত হবেন প্রগতিশীল বামপন্থী এবং স্বাধীন মতাবলম্বী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে। এই পদ্ধতি ছিল গণতন্ত্রভিত্তিক।

এই সময়ে মাও-এর ছয়টি প্রধান নীতি উল্লেখযোগ্য। খণ্ডিত সেনাদল (Crack troops) গঠন এবং সরল প্রশাসন (Simple administration), গ্রামমুখী অভিযান (Hsia-hasiang) যাতে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আর দলীয় ক্যাডাররা কৃষক ও শ্রমিকদের সঙ্গে একজোটে সাম্যবাদী আন্দোলনে সামিল হতে পারে। যে সব অঞ্চলে ভূমি-সংক্রান্ত কোনো সংস্কার কার্য সাধিত হয়নি, সেই সব অঞ্চলে খাজনা ও সুদের হার ২৫ থেকে ৪৯ শতাংশ হ্রাসকরণ, যাতে সুদসমেত খাজনা ভূমির উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশের অধিক না হয়। গ্রামীণ অর্থনীতি পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক এবং সমবায় আন্দোলন প্রবর্তন। সাংগঠনিক অর্থনীতি (Organizational economy) প্রবর্তন, যাতে প্রতিটি সংগঠন এবং ক্যাডার কায়িক এবং তত্ত্বাবধায়ক কার্যে (managerial and manual work) অংশ গ্রহণ করতে পারে। গ্রামীণ অঞ্চলসমূহের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের জন্য এক নতুন শিক্ষা আন্দোলন প্রবর্তন করেছিলেন মাও।

(গ) কৃষকদের জাতীয় সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা : ১৯৩০ দশকের গোড়ার দিকে চীনা সোভিয়েত অঞ্চলগুলিতে ভূস্বামীদের জমি ক্রোক করে সেগুলি ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছিল। কিন্তু গণতান্ত্রিক ঘাঁটিগুলিতে জমি ক্রোক না করে কৃষকদের ওপর থেকে খাজনার পরিমাণ প্রায় ২৫ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছিল। মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে কৃষকদের দেয় সুদের পরিমাণও অনেকটাই কমানো হয়েছিল। ভূস্বামীদের ওপর অতীত দিনের পুঞ্জীকৃত করের বোঝা চাপানো হয়েছিল। ভূস্বামী মহাজনদের কাছ থেকে যে সমস্ত কৃষকেরা ঋণ নিয়েছিলেন তাঁদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তাই চীনা সোভিয়েত এলাকায় যে জঙ্গী কৃষিনীতি ছিল তা অনেকটা পরিত্যক্ত হয়েছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ কৃষকদের অনুকূলে ও জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। এতে হয়তো কৃষকদের অর্থনৈতিক স্বার্থ কিছুটা বিসর্জন দিতে হয়েছিল, কিন্তু তাঁদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কারণ জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে

যোগদান করার ফলে তাঁদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়েছিল। তাঁরা নিজেদের সামরিক ক্ষমতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। নয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অঙ্গীভুত হয়ে তাঁদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে ভুস্বামী শ্রেণি সাধারণভাবে সাম্রাজ্যের সহায়ক শক্তি। কারণ তাঁরা জাপানি আক্রমণকে সমর্থন করেছিল। তবে ঘাঁটি এলাকায় যে জাপান বিরোধী সামন্ত প্রভু ছিল না তা নয়, তবে তারা ছিল মুষ্টিমেয় সংখ্যক।

(ঘ) উৎপাদনের জন্য সংগ্রাম : যখন জাপানি সৈন্য ও কে.এম.টি. বাহিনী মুক্তাঞ্চলগুলি ঘিরে ফেলেছিল তখন সেখানকার সরবরাহ পথগুলি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ও সেখানকার জনসাধারণের জীবন অচল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সি.সি.পি. বাস্তব ব্যবস্থা হিসাবে সৈন্য থেকে আরম্ভ করে কৃষক পর্যন্ত সকলকে উৎপাদন করার জন্য নির্দেশ দিল। ১৯৪১ সালে এইট্থ রুট আর্মির ৩৫৯ নম্বর বাহিনী ঘন ও গভীর নান্নিওয়ান অরণ্যাঞ্চল পরিষ্কার করে সেখানে কৃষি খামার, গবাদি পশুর চারণক্ষেত্র, হস্তচালিত বস্ত্রশিল্প এবং কাঠকয়লার উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করে এক অসম্ভব কাজ সম্ভব করার নজির সৃষ্টি করেছিল। এছাড়া সমবায় পদ্ধতিতে হস্তশিল্প গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এরকমভাবে কৃষি সরঞ্জাম, বস্ত্র, কাগজ ঔষধ প্রভৃতি তৈরি হত।

(ঙ) নারী প্রগতির সূচনা : ইয়েনানের মুক্তাঞ্চলে নারীরা প্রশংসনীয় ভাবে বিভিন্ন কাজে যুক্ত হবার প্রয়াস দেখিয়ে প্রগতির সামিল হয়েছিলেন। সৈন্যদের দেখাশোনা করা, কৃষিকাজে সাহায্য করা, শিল্প সমবায়ে কাজ করা, কুটির শিল্পে যুক্ত থাকা প্রভৃতি কাজে গণতান্ত্রিক ঘাঁটি এলাকার মহিলারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। গ্রামাঞ্চলে নারী সংগঠনগুলি মেয়েদের সামাজিক ও পারিবারিক অত্যাচার থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করত। তারা স্বামী শ্বশুর শাশুড়ির অত্যাচার থেকে, রাজনৈতিক ও সামাজিক নিপীড়ন থেকে মেয়েদের রক্ষা করত। জোর করে দেওয়া বিয়ে ভেঙে দিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও মেয়েরা সাধারণভাবে পিছিয়ে ছিল। স্থানীয় কমিটিগুলিতে মাত্র ৮ শতাংশ মেয়ে যেতে পেরেছিলেন। অল্প কয়েকজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলাই কেবলমাত্র পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন করতে পেরেছিলেন।

(চ) ইয়েনান সংস্কৃতি : সি.সি.পি. ইয়েনানে ঘাঁটি তৈরি করার পর ইয়েনানে সাম্যবাদ (Yenan Communism) গড়ে তুলেছিলেন, যা রাশিয়ার পছন্দসই ছিল না। ফলে এরপর থেকে রাশিয়ার সঙ্গে চীনের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। কিন্তু পশ্চিমের বেশ কিছু কম্যুনিস্ট ব্যক্তিগত উদ্যোগে চীনে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ডাক্তার নর্মান বেথুন, যিনি কানাডা থেকে এসেছিলেন। ভিয়েতনাম, কোরিয়া ও জাপানের কম্যুনিস্টরাও সেই সময়ে ইয়েনানে এসেছিলেন, যেমন ভিয়েতনামের হো চি মিন বা জাপানের নোসাকা সাঙ্গো। নোসাকা জাপানি যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে একটি মার্কসীয় শিক্ষাশিবির গড়ে তুলেছিলেন। বিভিন্ন শহরের বুদ্ধিজীবীরা মুক্তাঞ্চলের গ্রামগুলিতে নিরক্ষরতা দূর করার কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে সি.সি.পি. আয়োজিত শিল্পী-সাহিত্যিকদের একটি ফোরামের সামনে মাও শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বর্জন করে জনগণের অবস্থান নিয়ে তাদের জন্যই সৃজনশীল কাজ করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

১০.১.১৭ কে.এম.টি.-সি.সি.পি. সংগ্রামের শেষ পর্যায়

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠা : ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাপান আত্মসমর্পণ করল। দীর্ঘ আটবছর জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চীন জয়লাভ করল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনের গৌরব বৃদ্ধি পেল। কারণ চীন স্বৈরতন্ত্র ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে সংগ্রাম করেছিল। চিয়াং কাই শেকের নেতৃত্বাধীন

কে.এম.টি. দল এই সুযোগে আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল যার ফল হল চারবছর ব্যাপী এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। জাপানি আক্রমণের চাপে যে বিবাদ সুপ্ত ছিল, এখন তা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হল। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৯ সালে মাওয়ের নেতৃত্বে সি.সি.পি. কে.এম.টি.-কে চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করে ক্ষমতা দখল করল।

(ক) তৃতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের পটভূমিকা : জাপান যুদ্ধের সময় কে.এম.টি. দল প্রচুর বিদেশি অস্ত্র সংগ্রহ করেছিল। এখন তারা তা কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে উদ্যত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের বিশাল বাজার দখল করার জন্য কে.এম.টি.-কে মদত দিতে লাগল। এদিকে দীর্ঘ আটবছর যুদ্ধের পর চীনের সাধারণ মানুষ একটি শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক জীবনের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। এই ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সি.সি.পি. ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত একটি ইস্তাহারে শান্তি, গণতন্ত্র ও ঐক্যের পথে গৃহযুদ্ধ এড়ানোর এবং কে.এম.টি. দলের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে চীনের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার ঘোষণা করল। এই ঘোষণার সূত্র ধরে মাও চুংকিং-এ কে.এম.টি. নেতৃত্বের সঙ্গে মাসাধিক কাল ধরে আলাপ আলোচনা করেন। ১৯৪৫ সালের ১০ অক্টোবর কে.এম.টি.-সি.সি.পি. একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় যেকোনো মূল্যে গৃহযুদ্ধ এড়ানো হবে এবং 'রাজনৈতিক আলোচনা সংক্রান্ত সম্মেলন' আহ্বান করে দেশকে পুনর্গঠিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু কে.এম.টি. দল চুক্তি না মেনে সি.সি.পি.-র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে রচিত একটি কে.এম.টি. দলিল "Manual for the Suppression of the Communist Bandits" আবার চিয়াং সৈন্য বাহিনীর মধ্যে বিলি করার নির্দেশ দেন। আমেরিকান নীতিও গৃহযুদ্ধের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। আমেরিকান সেনাবাহিনীর প্রাক্তন প্রধান মার্শাল এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের নিজস্ব সচিব ডিন অ্যাচিসন চীন সফরে এসে ঘোষণা করলেন যে তাঁরা দুটি পরস্পর বিরোধী দলকে সমঝোতায় আনবেন এবং জাতীয়তাবাদী দলকে ক্ষমতায় আনবেন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করার অর্থ দেশে আবার রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ অনিবার্য করে তোলা।

(খ) কে.এম.টি. সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা : জাপান বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটিগুলিতে একদল উদারপন্থী গণতান্ত্রিক মানুষ সি.সি.পি.-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে ডেমোক্রেটিক লীগ গঠন করেছিলেন। কিন্তু ডেমোক্রেটিক লীগের নরমপন্থী অংশ বেরিয়ে এসে "ইয়ং চায়না পার্টি" গঠন করেছিল। ১৯৪৬ সালে যে 'রাজনৈতিক আলোচনা সংক্রান্ত সম্মেলন' আহূত হয়েছিল তাতে ডেমোক্রেটিক লীগ ও সি.সি.পি.-র সম্মিলিত চাপে পাঁচটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। যেমন, এমন একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করতে হবে যেখানে প্রতিটি রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। জাতীয় পুনর্গঠনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। কে.এম.টি. ও লালফৌজ ঐক্যবদ্ধভাবে একটি জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন করবে। একটি জাতীয় আইনসভা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনার পরে প্রদেশগুলিতে স্বায়ত্তশাসন চালু করা হবে। কে.এম.টি. সরকার এই সমস্ত প্রস্তাবগুলি মানল না, উপরন্তু চুং কিং-এ আলোচনা সম্মেলনের একটি অধিবেশনে সৈন্য দ্বারা হামলা চালাল, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে অস্বীকার করল, কম্যুনিস্ট নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র কার্যালয়গুলি ধ্বংস করল। কম্যুনিস্টরা তীব্র প্রতিবাদ করল কিন্তু কোনো প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করল না।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া ও মুকডেন দখল করে সেখানে মাঞ্চুকুয়ো সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে জাপানের আত্মসমর্পণের পর সোভিয়েত রাশিয়া মাঞ্চুকুয়ো সরকারকে নিজের প্রভাবাধীন করে তুলল। কে.এম.টি. সরকার এই অজুহাতে সি.সি.পি.র বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাতে লাগল। তারপর ১৯৪৬

সালের মার্চ মাসে সোভিয়েত বাহিনী মাঞ্চুরিয়া ত্যাগ করলে কে.এম.টি. বাহিনী তা দখল করে নিল। এবার আর সি.সি.পি. নিষ্ক্রিয় না থেকে প্রতি আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করল। অল্পকিছুদিনের মধ্যে সি.সি.পি. বাহিনী প্রায় সমগ্র উত্তর চীন দখল করে নিল।

সি.সি.পি. শুধু সামরিক আক্রমণের পথেই গেল না, তারা তাদের সংগ্রাম নীতিরও পরিবর্তন করল। ১৯৪৬-এর মাঝামাঝি সময়ে সি.সি.পি. নানকিং-এর সম্পদশালী ভূস্বামী শ্রেণির বিরুদ্ধে কৃষক জনতাকে সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এভাবে সি.সি.পি. যেমন অনিবার্য গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তেমন সামন্ততন্ত্র বিরোধী কৃষিবিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিল। যে সমস্ত ভূস্বামী ও সামন্তপ্রভু জাপানি আক্রমণকারীদের সাথে সহযোগিতা করেছিল সি.সি.পি. তাদের শাস্তিদানের দাবি তুলল। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে শ্লোগান উঠল কৃষকরাই হল জমির প্রকৃত মালিক। ভূস্বামী ও জমিদারদের ওপর চাপানো করের পরিমাণ বাড়ানো হল। যেইমাত্র জাপান আত্মসমর্পণ করল অমনি সি.সি.পি. ভূস্বামী সামন্তদের বিরুদ্ধে জঙ্গী কৃষক সংগ্রাম সমর্থন করতে শুরু করল।

(গ) কে.এম.টি. দলের পরাজয় : ১৯৪৬ সালের ২৬ জুন কে.এম.টি. বাহিনী সি.সি.পি. অধিকৃত মুক্তাঞ্চলগুলি আক্রমণ করতে শুরু করল। আমেরিকা প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও পরামর্শ দিয়ে কে.এম.টি.-কে সাহায্য করতে লাগল। 16 লক্ষ সৈন্য নিয়ে গঠিত কে.এম.টি. বাহিনী মুক্তাঞ্চল ঘিরে ফেলে সেখানে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করল। তখন সি.সি.পি. এক অভিনব রণকৌশল গ্রহণ করল। কম্যুনিস্ট বাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে মুক্তাঞ্চল সমূহের প্রধান শহরগুলি ছেড়ে চলে গেল। ফলে প্রায় সাত লক্ষ কে.এম.টি. সৈন্য সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়ল। অথচ সি.সি.পি. বাহিনী সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পুরো শক্তি নিয়ে দক্ষিণ শানটুং, শেনসি ও ইয়াংসির নিম্ন উপত্যকায় জোরদার কে.এম.টি বিরোধী আক্রমণ চালিয়ে তাদের দুর্বল করে ফেলল। কে.এম.টি. দলকে এভাবে বিপর্যস্ত করে সি.সি.পি.র গণফৌজ তাদের উপর্যুপরি আক্রমণ করতে লাগল। ১৯৪৭ সালে ডিসেম্বর মাসে সি.সি.পি.-র কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় মাও একটি প্রতিবেদন পেশ করলেন যার শিরোনাম "The Present Situation and Our Tasks" , এতে মাও দাবি করলেন যে কে.এম.টি. দলের কুড়ি বছরের প্রতিবিপ্লবী শাসনের অবসান আসন্ন। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কম্যুনিস্ট নিয়ন্ত্রিত কালাগান শহর দখল করে কে.এম.টি. দল একটি জাতীয় আইনসভা গঠন করে। কিন্তু সি.সি.পি. ও ডেমোক্রেটিক লীগকে অত্যন্ত অল্প আসন দেওয়ার জন্য প্রতিবাদস্বরূপ তারা ঐ আইনসভা বয়কট করল। একই বছরে ডিসেম্বর মাসে জাতীয় সভা একটি স্বৈরতন্ত্রী সংবিধান সৃষ্টি করে চিয়াং-এর হাতে অপ্রতিহত ক্ষমতা ন্যস্ত করল। এরপর কে.এম.টি. সরকারকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করার ডাক দিল।

(ঘ) কে.এম.টি. অধিকৃত অঞ্চলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন : সি.সি.পি. আক্রমণের চাপে ব্যতিব্যস্ত কে.এম.টি. সরকার নিজ স্বার্থরক্ষার তাগিদে আমেরিকার পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করল। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে চীন ও আমেরিকা যুক্তরাজ্যের মধ্যে যে বাণিজ্যিক, মিত্রতা ও নৌচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তার ফলে চিয়াং চীনের আঞ্চলিক, সামরিক, কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আমেরিকার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৪৭ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত চিয়াং পরিচালিত জাতীয়তাবাদী সরকার আমেরিকার কাছ থেকে প্রায় ৪০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সাহায্য লাভ করেছিল। মার্কিন পণ্যে কে.এণ.টি. অধিকৃত অঞ্চল ছেয়ে গিয়েছিল। গৃহযুদ্ধ চালানোর ব্যয় উশুল করার চেষ্টা হয়েছিল সাধারণ

মানুষের ওপর অত্যথিক কর চাপিয়ে। জাতীয় পুঁজিপতিদের মালিকানাধীন বাণিজ্য ও শিল্প ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ল। কৃষিও প্রায় ধ্বংসের মুখে দাঁড়ালো। কে.এম.টি. চীনে এক চরম অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিল। এখানে অস্বাভাবিক হারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেল। অকল্পনীয় মুদ্রাস্ফীতি জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলল। এই অস্বাভাবিক ও অসহনীয় অর্থনৈতিক সংকট কে.এম.টি. চীনে ব্যাপক প্রতিবাদ আন্দোলনের জন্ম দিল। শ্রমিক ও ছাত্র সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের সাধারণ মানুষ এই প্রতিবাদ আন্দোলনের সামিল হয়ে কে.এম.টি. সরকার ও মার্কিন সহায়কদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিপ্লবী যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুললেন। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সাংহাইতে যে বিক্ষোভ মিছিল হল তার মূল দাবি ছিল "আমেরিকান ফৌজ চীন ছাড়"। ডিসেম্বর মাসে দোকানদারদের সরকার বিরোধী বিক্ষোভ নিষ্ঠুরভাবে দমন করল কে.এম.টি. পুলিশ। কে.এম.টি. চীনের গ্রামাঞ্চলে সাবেকি ধাঁচের যে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিল তার জঙ্গী চরিত্রের রূপটি জমিদার বিরোধী দাঙ্গা, খাজনাদানে অস্বীকৃতি এবং কর আদায়কারীদের ওপর আক্রমণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল। কিন্তু আগে এই কৃষক আন্দোলনগুলি পরিচালনা করত কেন্দ্রীয় আদেশপুষ্ট গুপ্ত সইমতিগুলি। কিন্তু এখন বিদ্রোহীরা মুক্তাঞ্চলের কম্যুনিস্ট নেতৃত্বাধীন কৃষক বিপ্লবীদের সাথে যোগাযোগ করলেন। তাঁরা কে.এম.টি. মদতপুষ্ট সামন্ত শ্রেণির বিরুদ্ধে কৃষি বিপ্লব গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন।

(ঙ) ছাত্র আন্দোলন : ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে কে.এম.টি. অধিকৃত এলাকায় জঙ্গী ছাত্র আন্দোলন মাথাচাড়া দিল। এই আন্দোলন দমন করার জন্য কে.এম.টি. সরকার পুলিশ ও ফৌজের সাহায্য গ্রহণ করল। ১৯৪৭ সালের মে মাসে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সংকট, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ, মার্কিন সাম্রাজ্যের তাঁবেদারী প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন বড়ো শহরে জঙ্গী ছাত্র আন্দোলনের পুনরুত্থান ঘটল। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ চিয়াং সরকার তৎক্ষণাৎ Provisional Measures for the Maintenance of Order নামে একটি আইন পাশ করে ধর্মঘট, মিছিল. বিক্ষোভ ইত্যাদি নিষিদ্ধ করে দেয়। অক্টোবর মাস চিয়াং যখন ডেমোক্রেটিক দলটি ভেঙে দিলেন তখন ঐ স্বৈরাচারী আচরণে কে.এম.টি. দল সম্পর্কে যাবতীয় মোহ ভঙ্গ হল। এঁদের অধিকাংশ সি.সি.পি.-র সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। অবশিষ্টাংশ এবং কে.এম.টি. অপশাসন উচ্ছেদ এবং মার্কিন অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্য সি.সি.পি.র সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার কথা ঘোষণা করলেন। চীনা কৃষক ও শ্রমিক দলের মতো গণতান্ত্রিক দলগুলিও কে.এম.টি. বিরোধী রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এইভাবে সি.সি.পি.-র নেতৃত্বে একটি জনগণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠল। ১৯৪৮ সালের ১ মে সি.সি.পি. একটি নতুন 'জনগণের রাজনৈতিক আলোচনা সংক্রান্ত সম্মেলন' আহ্বান করার কথা ঘোষণা করল। বলা হল যে এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক মোর্চা সরকার গঠিত হবে এবং সেখানে কে.এম.টি. স্বৈরাচারীরা স্থান পাবে না। বিভিন্ন স্তরের গণতান্ত্রিক মানুষ এই প্রয়াসকে স্বাগত জানাল।

১০.১.১৮ তৃতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধে কম্যুনিস্টদের বিজয়

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে গণমুক্তি ফৌজ কে.এম.টি. বাহিনী দ্বারা সুরক্ষিত বড়ো বড়ো শহরগুলি দখল করে নিল। ফলে ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে কে.এম.টি. সরকারের অভ্যন্তরীণ শাসন দুর্বল হয়ে পড়ল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনটি বড়ো সফল সামরিক অভিযানের দ্বারা প্রায় সমগ্র উত্তর চীন গণফৌজের দখলে চলে এল। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত সি.সি.পি. কেন্দ্রীয় কমিটির

দ্বিতীয় প্লেনারি অধিবেশনে মাও কম্যুনিস্ট কর্মীদের শহরাঞ্চলে তাদের কাজের পরিধি বাড়ানোর আহ্বান জানালেন। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগের মধ্য দিয়ে একটি জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং চীনকে সমাজতন্ত্রের পথে উত্তরণের বিষয় নিয়েও ঐ অধিবেশনে বিশদ আলোচনা হয়।

পরাজয়ের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে চিয়াং সি.সি.পি.-র কাছে শান্তির প্রস্তাব পাঠালেন। সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ থেকে জানুয়ারি ১৯৪৯ পর্যন্ত চিয়াং সরকারের ১৫ লক্ষ সৈন্য প্রাণ হারিয়েছিল। এমতাবস্থায় কে.এম.টি.-র শান্তিকামী দল চিয়াংকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করল। চিয়াং ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২১ জানুয়ারি পদত্যাগ করলেন, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি লি সুং জেন দক্ষিণ চীনে জাতীয়তাবাদীদের অধিকার বজায় রাখার আশায় সি.সি.পি.-র সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাতে লাগলেন। কিন্তু মাও কোনোরকম আপোষ মীমাংসার কথা অগ্রাহ্য করলেন। ১৯৪৯ সালের ২১ এপ্রিল তাঁর সেনাবাহিনী ইয়াংসি নদী অতিক্রম করে দক্ষিণ চীনে উপনীত হল এবং তিনদিন পর কে.এম.টি. সরকারের প্রধান কর্মকেন্দ্র নানকিং অধিকার করে নিল। কে.এম.টি. সরকারের কর্মকেন্দ্র তখন ক্যান্টনে স্থানান্তরিত হল। সাম্যবাদীরা এখন চীনে আর কোনো বাধার সম্মুখীন হল না। ১৯৪৯ সালে ১ অক্টোবর কার্যত চীন বিজয়ের আগে মাও চীনা জনগণতন্ত্রে (Reoples' Republic of China) প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করলেন। জাতীয়তাবাদী সরকার ১৯৪৯ সালের ১৩ অক্টোবর ক্যান্টন ত্যাগ করে চুংকিং-এ কর্মকেন্দ্র স্থাপন করল। ১৯৪৯ সালের ১৩ অক্টোবর জাতীয়তাবাদী সরকার ক্যান্টন ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে ফরমোজায়, বর্তমান তাইওয়ানে প্রতিষ্ঠিত হল। তখন সাম্যবাদীদের সমগ্র চীনা ভূখণ্ড বিজয় সম্পূর্ণ হল। দীর্ঘ ২৮ বছর (১৯২১-৪৯) সংগ্রামের পর মাও সে তুং ক্ষমতার শীর্ষাসন গ্রহণ করতে সক্ষম হলেন।

১০.১.১৯ মাও-র সাফল্যের কারণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও আর্থিক সাহায্যপুষ্ট চিয়াং কাই শেককে পরাস্ত করার সম্ভাবনা প্রথম দিকে সুদূর পরাহত ছিল। মাও-র না ছিল আর্থিক সঙ্গতি না ছিল উপায় উদ্ভাবনের সম্ভাবনা। তদুপরি সোভিয়েত রাশিয়া প্রথম দিকে চিয়াংকে সমর্থন জানিয়েছিল। কিন্তু বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জোরে জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন আদায় করে শেষ পর্যন্ত মাও বিজয়ী হন। দেশের কাছে মাও-এর দুটি আবেদন—বিদেশি সাম্রাজ্যবাদিতার বিরোধিতা এবং সামাজিক ন্যায় বিচার প্রবর্তন চীনা জাতির অন্তর স্পর্শ করেছিল। এক শক্তিশালী চীন গঠিত হবে— যেখানে কোনো সামাজিক বা অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকবে না—মাও-এর এই আদর্শ চীনা জনগণের এতই মনঃপুত হয়েছিল যে তারা মাওকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন করেছিল। ফলে মাও-এর ক্ষেত্রে সাফল্য হয়ে উঠেছিল অনিবার্য। মাও সঠিকভাবে নির্ধারণ করেছিলেন যে কৃষিপ্রধান চীনে কৃষকদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। তাই কৃষকদের স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তিনি কৃষক সম্প্রদায়ের পূর্ণ ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। কৃষকরা লাল ফৌজের সাথে মিলিত হয়ে কে.এম.টি. বাহিনীকে পরাভূত করেছিলেন। এছাড়া মাও কতকগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়িত করেছিলেন। যেমন, ভূমি-সংক্রান্ত সংস্কার-সাধন, বিদেশি সাম্রাজ্যবাদিতার অবসান, সেনাবাহিনীতে নিয়মানুবর্তিতা ও আজ্ঞাধীনতা প্রবর্তন, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সৎ কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি। এর ফলে মাও জনসাধারণের আস্থা ও সমর্থন আদায় করেছিলেন। অন্য দিকে চিয়াং প্রশাসন ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত। তা কোনো সদর্থক কর্মসূচি বা ভবিষ্যতের সন্ধান দিতে পারেনি।

চিয়াং প্রশাসন নগরকেন্দ্রিক হওয়ার ফলে গ্রামের ওপর শহরের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার আশঙ্কায় কৃষক সম্প্রদায়ের কাছে তা গ্রহণযোগ্য ছিল না। কে.এম.টি. সেনাদলও শেষ পর্যন্ত চিয়াং সরকারের প্রতি অনুগত ছিল না। কারণ জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য স্পষ্ট কারণ ছিল, কিন্তু গৃহযুদ্ধের কোনো কারণ সেনাদলের বোধগম্য হয়নি। ফলে তাদের মধ্যে যুদ্ধ করার কোনো উৎসাহ ছিল না। তদুপরি তাদের ছিল প্রয়োজনীয় খাদ্যাভাব, প্রয়োজনীয় যুদ্ধোপকরণের অভাব। ফলে তারা স্বাভাবিকভাবেই সাম্যবাদী সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেছিল। এ সমস্ত কিছু সাম্যবাদীদের নৈতিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি করেছিল। ফলে, সাম্যবাদীদের সাফল্য অবধারিত হয়ে উঠেছিল।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মাওবাদী চীনের উত্থানের অভিঘাত : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে মাওবাদী তথা সাম্যবাদী চীনের উদ্ভব সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা কিন্তু তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল নয়। তবে, যুদ্ধের ফলে চিয়াং কাই শেকের জাতীয়তাবাদী সরকারের দুর্বলতা প্রকট হয়ে পড়েছিল। দরিদ্র ও কৃষক শ্রেণির দুর্দশা বৃদ্ধি পাবার ফলে চিয়াং কাই শেককে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভবপর হয়েছিল। এর ফলে ঔপনিবেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে চীন একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে অভূতপূর্ব এক রাজনৈতিক অভিজ্ঞান লাভ করেছিল। তাই একদিকে চীন যেমন তার রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হল, অপরদিকে এশিয়া, অফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা অত্যাচরিত জনগণের সঙ্গে একাত্মবোধ করতে লাগল। কে.এম.টি. পরিচালিত জাতীয়তাবাদী সরকারের প্রতি আমেরিকা অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিল। তাই জাপানি আক্রমণ রোধ করার জন্য এবং অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের জন্য আমেরিকা চীনকে বহু অর্থ ও সামরিক সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করেছিল। কিন্তু মাও পরিচালিত সাম্যবাদী দল যখন চীনে ক্ষমতা দখল করল তখন স্বাভাবতই আমেরিকা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত বোধ করল। আমেরিকা ও চীনের সম্পর্কের অবনতি ঘটল অনিবার্যভাবে। এর প্রতিফলন দেখা গেল কোরিয়ার যুদ্ধে। মার্কিন প্রভাবিত দক্ষিণ কোরিয়া সোভিয়েত প্রভাবিত উত্তর কোরিয়া দখল করে সোজা চীন সীমান্তে উপনীত হল। বিপন্ন ও ভীত চীন উত্তর কোরিয়ার সাহায্যার্থে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পাঠাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আমেরিকা উত্তর কোরিয়া তো বটেই দক্ষিণ কোরিয়ার একাংশ কম্যুনিস্টদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। ইন্দোচীনেও প্রায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। সেখানে উত্তরাংশে হো চি মিনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত কম্যুনিস্ট ভিয়েতমিনকে স্বীকৃত দিল চীন, সোভিয়েত রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিস্ট দেশসমূহ। রুষ্ট আমেরিকার প্ররোচনায় রাষ্ট্রসংঘ থেকে চীন বিতাড়িত হল। শুধু তাই নয়, চীনের জাতীয়তাবাদী সরকারের অধীনস্থ ফরমোজা ও তার পার্শ্ববর্তী দ্বীপগুলি আমেরিকান নৌ ও সামরিক সুরক্ষায় ছিল বলে কম্যুনিস্ট সরকার কখনোই এই অঞ্চলগুলি অধিকার করতে পারল না। ফলে চীন ও আমেরিকা পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে রইল।

গণপ্রজাতন্ত্রী চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ার স্বাভাবিক বন্ধুত্ব রূপ পেয়েছিল ১৯৫০ সালে স্বাক্ষরিত মৈত্রী ও পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তিতে। মনে হয়েছিল যে রাশিয়া ও চীন মিলে একটি দৃঢ় শক্তিজোট গঠন করবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই শক্তিজোট মোটেও স্থায়ী হল না। কারণ, সাম্যবাদের প্রসারের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম বিরোধের সূচনা হল, যার জন্য রাশিয়া চীনকে পারমাণবিক অস্ত্র ধার দিতে চাইল না। তবুও ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চীনের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। এমনকি ১৯৫৭ সালের ১৫ অক্টোবর সোভিয়েত রাশিয়া চীনকে আনবিক অস্ত্র প্রস্তুতিতে সহায়তা করতে রাজি ছিল। চীনও হাঙ্গেরিতে বিদ্রোহ দমনে সোভিয়েত রাশিয়ার নীতি সমর্থন করেছিল। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের

নভেম্বরে মস্কোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব কম্যুনিস্ট সম্মেলনেও চীন সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ব্যক্ত করেছিল।

চীনে গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর তার নিজের পাশ্চাত্য বিরোধিতার সঙ্গে এশিয়া, আফ্রিকার সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলির পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি মিলে গিয়েছিল। কিন্তু চীন সহযোগিতামূলক নীতির পাশাপাশি আধিপত্যমূলক মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয়েছিল। ভারতের সঙ্গে চীনের সম্পর্কে এই সহযোগিতা ও সংঘাতের দ্বৈত চরিত্রের আশ্চর্য প্রতিফলন ঘটেছিল। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চশীল নীতির ভিত্তিতে চীন ও ভারতের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। ১৯৫৫ সালে বান্দুং সম্মেলনে এশিয়া ও আফ্রিকার ২৯ টি দেশ যোগদান করেছিল। এই সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পঞ্চশীলের যৌক্তিকতা তুলে ধরেছিলেন। চৌ এন লাই আরো বলেছিলেন যে সমচিন্তার সন্ধানের জন্যই চীন এই সম্মেলনে যোগদান করেছে। এরপর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনের মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। মধ্য প্রাচ্যের রাজনীতি অশান্ত হয়ে উঠলে চীন আরব জাতীয়তাবাদের পক্ষ সমর্থন করল। ১৯৫৬ সালে মিশরের উপর ইজরায়েল, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের যৌথ আক্রমণের বিরুদ্ধে মিশরকে চীন সমর্থন করেছিল। কিন্তু এর পাশাপাশি চীন এশিয়ার রাজনীতিতে পেশী শক্তির প্রয়োগ করেছিল। তিব্বতের উপর চীন বলপূর্বক আধিপত্য স্থাপন করেছিল। ভারতের সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষে লিপ্ত হল, যার পরিণতিতে ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধ শুরু হল। এসবের মধ্যে দিয়ে এশিয়াতে চীনের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার তাগিদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

১০.১.২০ উপসংহার

এক অভূতপূর্ব ক্রান্তিকালে পূর্ব এশিয়ার আধুনিক যুগ শুরু হয়েছিল। একদিকে ছিল আধুনিক শিল্পবিজ্ঞানে শক্তিশালী নবীন পাশ্চাত্য, অপরদিকে ছিল প্রাচীন ঐতিহ্যের অচলায়তনে বন্দী চীন। ফলে সংঘাত ছিল অনিবার্য। এই সংঘাতে চীনের পক্ষে জয়ী হবার একমাত্র উপায় ছিল পুরোনো ঐতিহ্যের মোহ ত্যাগ করে পশ্চিমের আধুনিক ভাবধারা ও রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থা নিজের প্রয়োজনানুযায়ী আত্মস্থ করা। এই কঠিন কাজটি চীন করেছিল বিলম্বিত লয়ে। তাই তার দুঃখ হয়েছিল দীর্ঘস্থায়ী। বহিঃশত্রুর আক্রমণ ছাড়াও সামন্ততান্ত্রিক অপশাসন ও বিভিন্ন অঞ্চলে গণবিদ্রোহের ফলে চীনের অভ্যন্তরীণ অবস্থাও সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল। তখন চীনে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল প্রাচীনপন্থী ও কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের প্রতিরোধে সংস্কার আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল। তবে ততদিনে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা বিশেষত বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র সম্প্রদায় সামন্ততান্ত্রিক শোষণে দীর্ণ সমাজশৃঙ্খল ভাঙার প্রয়োজন অনুভব করেছিল। এর পরিণতি হল ৪ মের আন্দোলন, যা নতুন সংস্কৃতি অধিগত করার জন্য চীনকে যোগ্য করে তুলেছিল। এই আন্দোলনের শেষে দুটি রাজনৈতিক দলের সক্রিয়তা শুরু হয়। দুটি দলই জাতির মুক্তিসাধনা করতে গিয়ে পারস্পরিক বিবাদে লিপ্ত হয়। এই বিবাদে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় সাম্যবাদী দল। এর নেতৃত্বে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে চীন সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিল।

১০.২ সারাংশ

উনবিংশ শতাব্দীতে চীনের সঙ্গে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সংযোগ ঘটেছিল, ফলে চীনে আধুনিকতার সূচনা হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর চীনে একইসঙ্গে জাতীয়তাবাদ ও সাম্যবাদের জন্ম হয়েছিল। ড: সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে ১৯১১ সালের বিপ্লব চীনে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করল। কিন্তু প্রজাতন্ত্র স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে অভ্যস্ত চীনে শিকড় বিস্তার করতে পারার আগেই জঙ্গী সমর নায়করা ক্ষমতা দখল করল। কিন্তু তাদের অপশাসনে অতিষ্ঠ চীনা জনসম্প্রদায় নতুন ভাবাদর্শ গ্রহণ করতে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। এইভাবে চীনে সাম্যবাদ এক উর্বর জমি লাভ করেছিল। চৌঠা মে'র সংস্কারকামী আন্দোলন সাম্যবাদের প্রসারে সহায়তা করেছিল। সান ইয়াৎ সেনের কুয়োমিনতাং দল সাম্যবাদীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চীনের সমরনায়কদের বিনাশ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যু কুয়োমিনতাং দল কম্যুনিস্টদের উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল। ইতিমধ্যে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করল। চিয়াং জাপানি জঙ্গীদের দ্বারা কম্যুনিস্টদের ধ্বংস করার চিন্তা করলেন। এদিকে সাম্যবাদী দলের মধ্যেও গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কার্যকারিতা ক্রমশ মাও সে তুং-এর পদ্ধতিকে সঠিক প্রমাণিত করল। মাও হয়ে উঠলেন, কম্যুনিস্ট দলের অবিসংবাদিত নেতা। মাও-এর অনবদ্য নেতৃত্ব চীনা জনগণের মধ্যে এক নতুন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা নিয়ে এল। মাও-এর গেরিলা যুদ্ধ নীতি পরাক্রান্ত জাপানকে পর্যুদস্ত করে তুলল। মাও-এর নেতৃত্বাধীন নতুন চেতনায় উদ্ভাসিত জনসাধারণ একই সঙ্গে পরাস্ত করল চিয়াং কাই শেকের জাতীয়তাবাদী সরকারকে এবং জাপানি জঙ্গী আক্রমণকে। জনসমর্থিত চীনা গণপ্রজাতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র এবং ঔপনিবেশিকতার দুঃস্বপ্ন মুছে ফেলে নতুন দিনের স্বপ্ন সফল করল।

১০.৩ অনুশীলনী

প্রশ্নাবলি ও উত্তর সংকেত

১. উনবিংশ শতাব্দীতে চীনের সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের সংস্পর্শের ফলাফল কি হয়েছিল?
উ: ২.১.১, ২.১,২, ২.১.৩. অনুচ্ছেদ দেখুন।

২. ড: সান ইয়াৎ সেনের কর্মজীবনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
উ: ২.১.৪, ২.১.৫ অনুচ্ছেদ দুটি দেখুন।

৩. ১৯১১ সালে বিপ্লবের তাৎপর্য কি? এই বিদ্রোহ কেন ব্যর্থ হয়েছিল?
উ: ২.১.৬ অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪. চীনে প্রথম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস কিভাবে ব্যর্থ হল?
উ: ২.১.৬ অনুচ্ছেদ দেখুন।

৫. চীনে কম্যুনিজম্ প্রসারের প্রথম পর্যায়ে রাশিয়ার ভূমিকা কি ছিল?
উ: ২.১.৭ অনুচ্ছেদ দেখুন।

৬. প্রথম দিকের চীনা কম্যুনিস্ট নেতাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

উ: ২.১.৭ অনুচ্ছেদ দেখুন।

৭. সমর নায়কদের শাসনকাল চীনের ইতিহাসে কি অবদান রেখেছিল?

উ: ২.১.৮ অনুচ্ছেদ দেখুন।

৮. চৌঠা মে'র আন্দোলন কেন হয়েছিল? কিভাবে চীনের জনজীবন এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল?

উ: ২.১.৯ অনুচ্ছেদ দেখুন।

৯. সান ইয়াৎ সেনের ওপর রাশিয়ার প্রভাব কতখানি ছিল তা বিশ্লেষণ করুন। সান কেন কম্যুনিস্টদের সাথে সমঝোতা করার পক্ষপাতী ছিলেন?

উ: ২.১.১০ অনুচ্ছেদ দেখুন।

১০. আপনি কি মনে করেন যে কুয়োমিনতাং ও কম্যুনিস্টদের বিরোধ অনিবার্য ছিল? এ বিষয়ে আপনার মতামত দিন।

উ: ২.১.১১ অনুচ্ছেদ থেকে লিখুন। এ ছাড়াও ২.১.১০ অনুচ্ছেদের সাহায্যে উত্তর তৈরি করুন।

১১. কে.এম.টি.-কম্যুনিস্টদের বিচ্ছেদ কিভাবে ঘটল? কেন এই বিরোধ ও বিচ্ছেদ ঘটেছিল?

উ: ২.১.১১ অনুচ্ছেদ দেখুন।

১২. নানকিং সরকারের সমস্যা কিভাবে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতিতে সাহায্য করেছিল?

উ: ২.১.১২ অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৩. মস্কোপন্থী কম্যুনিস্টদের ব্যর্থতা কিভাবে মাও-সে তুংয়ের উত্থানে সাহায্যকরেছিল?

উ: ২.১.১২ অনুচ্ছেদের (ঘ) ও (ঙ) অংশ দেখুন।

১৪. কোন পটভূমিকায় 'লং মার্চ' হয়েছিল? এরতাৎপর্য কি ছিল?

উ: ২.১.১৩ এবং ২.১.১৪ অনুচ্ছেদের যথাযথ সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এই উত্তরটি লিখবেন।

১৫. কেন কে.এম. টি.-সি.সি.পি. যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠেছিল? কেন তা স্থায়ী হতে পারল না?

উ: ২.১.১৫এবং ২.১.১৬ অনুচ্ছেদ মিলিয়ে উত্তর তৈরি করুন।

১৬. জাপানি আক্রমণের মোকাবিলা মাও সে তুং-এর নেতৃত্বকে সর্বজনগ্রাহ্য করেছিল--আপনি কি এই মত গ্রহণ করবেন?

উ: ২.১.১৬ (ক)অংশ থেকে উত্তর দিন।

১৭. ইয়েনানের নতুন ব্যবস্থা কি কি নতুনত্ব এনেছিল? একে কি আপনি গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের পদধ্বনি বলবেন?

উ: ২.১.১৬ (খ), (গ), (ঘ),(ঙ) ও (চ) অংশগুলি সংযোজন করে উত্তর দেবেন।

১৮. কিভবে শেষপর্যন্ত মাও-এর নেতৃত্বে সি.সি.পি. জয়ী হল তার বিবরণ দিন। বিশ্লেষণ করুন কেন মাও সফল হয়েছিলেন?

উ: ২.১.১৭ এবং ২.১.১৮ অনুচ্ছেদের বিভিন্ন অংশগুলি থেকে উত্তরের পক্ষে প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি চয়ন করুন। প্রশ্নের শেষাংশের জন্য ২.১.১৯ অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৯. গণপ্রজাতন্ত্রী চীন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কি প্রভাব বিস্তার করেছিল?
উ: ২.১.১৯ অনুচ্ছেদ থেকে উত্তর লিখুন।

১০.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১. চীনের ইতিহাস—ডঃ হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

২. চীন ও জাপানের ইতিহাস—ডঃ সিদ্ধার্থ গুহরায়।

৩. আধুনিক যুগে পূর্ব এশিয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—শ্রীদেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী।

৪. A History of the Far East in Modern Times—Harold M. Vinacke.

৫. East Asia— The Modern Transformation—Fairbank and others.

৬. The Far East—Clyde and Beers.

৭. China from the Opium War to the 1911 Revolution—Jean Chesneaux and others.

একক ১১ ❐ ঠান্ডা যুদ্ধের উদ্ভব এবং তার বিবর্তন

গঠন

১১.১ উদ্দেশ্য
১১.২ প্রস্তাবনা
১১.৩ ঠান্ডা যুদ্ধ : সংজ্ঞা
১১.৪ ঠান্ডা যুদ্ধের পটভূমি
১১.৫ ঠান্ডা যুদ্ধের উদ্ভব—প্রসার
১১.৫.১ ইরান, গ্রীস এবং তুর্কী সংকট
১১.৫.২ ঠান্ডা যুদ্ধের প্রসার : ইউরোপ
১১.৫.৩ ঠান্ডা যুদ্ধের প্রসার : এশিয়া
১১.৫.৪ পূর্ব-পশ্চিম সম্পর্কের উন্নতি এবং নব্য ঠান্ডা যুদ্ধ (Neo Cold War)
১১.৫.৫ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান
১১.৬ ঠান্ডা যুদ্ধের উদ্ভবের দায়িত্ব
১১.৭ সারাংশ
১১.৮ অনুশীলনী
১১.৯ উত্তরসংকেত
১১.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি আপনাকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্যায়ে, বিশ্বরাজনীতির অন্যতম সমস্যা ঠান্ডা যুদ্ধ (cold war) সম্বন্ধে অবহিত করাবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন—

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানে বিশ্ব রাজনীতির পরিস্থিতি।
- বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশ্বশক্তি (Super Power) হিসাবে উত্থান।
- বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব বাড়াবার উদ্দেশ্যে উভয় দেশের দ্বন্দ্ব।
- ঠান্ডা যুদ্ধের প্রসারের ধারা।
- ঠান্ডা যুদ্ধ উদ্ভবের দায়িত্ব।

১১.২ প্রস্তাবনা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে, বিশ্বরাজনীতিতে এক সংকটময় পরিস্থিতির সূচনা হয়। মিত্র-শক্তি গোষ্ঠীর দ্বারা অক্ষ-শক্তি গোষ্ঠীর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটলেও মিত্র-জোটের অন্তর্ভুক্ত প্রধান ইউরোপীয় দেশগুলিও ভীষণভাবে

দুর্বল হয়ে পরে। গ্রেট ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের মতন বৃহৎ সাম্রাজ্যশালী দেশগুলিও এর ব্যতিক্রমী ছিল না। এর ফলে ১৯৪৫ সালের পর বিশ্বরাজনীতিতে ইউরোপীয় শক্তিগুলির আধিপত্যের অবসান ঘটে। এদের পরিবর্তে, বিশ্বরাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তারের সচেষ্ট হয় দুই নতুন শক্তি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন। অচিরেই এই আধিপত্য এবং নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার প্রচেষ্টা বিশ্বরাজনীতিতে এক নতুন দ্বন্দ্ব সম্পর্কের সৃষ্টি করে যাকে 'ঠান্ডা যুদ্ধ' বলে অভিহিত করা হয়। এই এককের অন্যান্য অংশে ঠান্ডা যুদ্ধ কিভাবে বিশ্বরাজনীতির অন্যতম সমস্যা হয়ে ওঠে তার আলোচনা করা হয়েছে।

১১.৩ ঠান্ডা যুদ্ধ : সংজ্ঞা

ঠান্ডা যুদ্ধ বলতে আমরা সাধারণত একটি দীর্ঘমেয়াদী, দ্বন্দ্বমূলক পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বুঝি। বিশ্ব ইতিহাসে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে 'ঠান্ডা যুদ্ধ' কথাটির ব্যবহার, বিংশ শতাব্দীর আগেও লক্ষ্য করা যায়। 'ঠান্ডা যুদ্ধ' কথাটির প্রথম ব্যবহার আমরা চতুর্দশ খ্রিস্টাব্দের স্পেনীয় লেখক ডন জুয়ান ম্যানুয়েলের (Don Juan Manuel) লেখায় পাই। ম্যানুয়েল তৎকালীন খ্রিস্টীয় এবং ইসলামীয় সভ্যতার মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ (Crusade) আলোচনার প্রসঙ্গে এই কথাটির ব্যবহার করেন।

পরবর্তীকালে 'ঠান্ডা যুদ্ধ' কথাটির প্রয়োগ এই ধরনের কোনো দীর্ঘমেয়াদী দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক বোঝাতে ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন, উনবিংশ খ্রিস্টাব্দের শেষার্ধে এবং বিংশ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে সামরিক প্রতিযোগিতা এবং উপনিবেশ দখলের লড়াই বোঝাতে 'ঠান্ডা যুদ্ধ' কথাটির আরো ব্যাপক প্রয়োগ করা হয়। পরবর্তীকালে অবশ্য, ঠান্ডা যুদ্ধ বলতে মূলত দুই বিশ্বশক্তির দ্বন্দ্ব বোঝানো হয়। ১৯৭০-এর দশকে উভয় দেশের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক (Detenté) স্থাপনের চেষ্টা কিছুমাত্রায় সফল হয়। কিন্তু ১৯৮০-এর দশকে, সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক আফগানিস্থানে সেনা প্রেরণ করা (১৯৭৯-৮০) এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগন (Ronald Reagon) পুনরায় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করার ফলে ঠান্ডা যুদ্ধের একটি নতুন পর্যায় শুরু হয়, যাকে অনেকে 'নব্য ঠান্ডা যুদ্ধ' বা 'Neo Cold War' বলে অভিহিত করেন।

১৯৮০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য ঠান্ডা যুদ্ধ সংক্রান্ত রেষারেষির অনেকখানি পরিসমাপ্তি ঘটে। এই রেষারেষি বন্ধ করার মূল উদ্যোগ নেন তৎকালীন সোভিয়েত রাষ্ট্রপতি মিখাইল গোর্বাচেভ (Mikhael Gorbachev). ১৯৯১ সালের পরবর্তীকালে অবশ্য বিশ্বরাজনীতিতে আরো ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। এর মধ্যে অন্যতম হল সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন। এর ফলে ১৯৯১ সালে মার্কিন-সোভিয়েত ঠান্ডা যুদ্ধের সমাপ্তি হয়।

১১.৪ ঠান্ডা যুদ্ধের পটভূমি

পূর্বেই বলা হয়েছে যে ঠান্ডা যুদ্ধ উদ্ভবের পেছনে মূল কারণ হলো, মার্কিন-সোভিয়েত দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক। এই দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আরো ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হলেও এর অনেক আগেই এই দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের সূচনা হয়।

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমী ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তৎকালীন পরিস্থিতিতে অনেকেই ভেবেছিলেন যে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, বিশ্ববিপ্লবের (World Revolution) প্রথম পদক্ষেপ। রাশিয়ায় বহু প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা, যেমন, ট্রটস্কি (Trotsky) সেই সময় 'বিশ্ব বিপ্লবের কথা' বলেছিলেন এবং পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রমিকদের বিপ্লব অনুষ্ঠিত করার কথা বলতেন। এর ফলে, পশ্চিম ইউরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি মহলের অনেকেই সোভিয়েত নীতি সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। মার্কিন সরকার নতুন সমাজতান্ত্রিক সরকারকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে এবং মার্কিন স্বরাস্ট্র দপ্তর একটি 'রাশিয়া বিভাগ' খোলে। পূর্ব ইউরোপে ল্যাটভিয়ার (Latvia) রাজধানী রিগায় (Riga) একটি মার্কিন তথ্য সংগ্রহকারী দপ্তর খোলা হয় মূলত সোভিয়েত সরকারি কার্যকলাপের ওপর নজর রাখবার উদ্দেশ্যে। ১৯২০-র দশকের পরবর্তীকালে অবশ্য বিশ্বরাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত সরকারের সম্পর্ক কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। রাশিয়া বিশ্ব বিপ্লবের নীতি ঘোষণা থেকে নিজেকে বিরত করে। অপরদিকে, পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলি নতুন সোভিয়েত সরকারকে স্বীকৃতি দেয় এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৩৩ সালে সোভিয়েত সরকারকে এই স্বীকৃতি প্রদান করে। এছাড়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন লীগ অফ্ নেশনস-এর (League of Nations) সদস্যপদ লাভ করে।

এই ধরনের সহযোগিতা অবশ্য পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং সন্দেহের পরিবেশকে সম্পূর্ণ নির্মূল করতে অক্ষম হয়। ১৯৩০-এর দশকে স্তালিনের উত্থান এবং তাঁর দ্বারা বিরোধী রাজনৈতিক গোষ্ঠী নির্মূল করার নীতিপ্রয়োগ, ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে আবার শঙ্কিত করে তোলে। এর ফলে, সোভিয়েত ইউনিয়ন শেষ পর্যন্ত নাৎসী জার্মানির সঙ্গে একটি অনাক্রমণ চুক্তি (Non Aggression Pact), ১৯৩৯ সালে স্বাক্ষর করে। এর ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে (১৯৩৯-৪১) সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে। এছাড়া, জার্মানির সঙ্গে সহযোগিতা করে রাশিয়া, পূর্ব পোল্যান্ডের কিছু এলাকা এবং ফিনল্যান্ড দখল করে নেয়।

১৯৪১ সালে জার্মানি, সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার ফলে অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন মিত্র পক্ষে যোগদান করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এক নতুন মাত্রা লাভ করে। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন, নাৎসী জার্মানির নেতৃত্বাধীন অক্ষশক্তিকে ধ্বংস করার কাজে নিজেদের নিযুক্ত করে। মিত্র শক্তির এই বৃহৎ জোটকে ব্রিটেনের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী চার্চিল 'গ্র্যান্ড এলায়েন্স' (Grand Alliance) বলে অভিহিত করেছিলেন। মিত্র জোট শেষপর্যন্ত অক্ষ-জোটকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করায় ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি এবং নাৎসী জার্মানির পরাজয় ইউরোপে একটি রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি করে। মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী যা 'লাল ফৌজ' (Red Army) নামে অধিক পরিচিত ছিল, নাৎসী বাহিনীকে পরাজিত করে। নাৎসী বাহিনীর পরাজয়ের পর, লাল ফৌজের সাহায্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করে। এই দেশগুলির মধ্যে প্রধান ছিল, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, রুমেনিয়া এবং পূর্ব জার্মানি। অল্প সময়ের মধ্যে, এই দেশগুলিতে সোভিয়েত প্রভাবিত সরকার স্থাপিত হয় এবং অ-কমিউনিস্ট বিরোধী গোষ্ঠীগুলিকে নির্মূল করা হয়। পূর্ব ইউরোপ এইভাবে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে ওঠে।

অপরদিকে, পশ্চিম ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক দেশগুলিও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে মার্কিন অনুদানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এর ফলে, এই অঞ্চলে মার্কিন আধিপত্য স্থাপিত হয়।

ইউরোপ এবং পরবর্তীকালে বিশ্বরাজনীতির মানচিত্রে নিজেদের প্রভাবশীল অঞ্চল গড়ে তোলার চেষ্টা উভয় পক্ষের দ্বন্দ্ব আরো তীব্র করে তোলে।

১১.৫ ঠান্ডা যুদ্ধের উদ্ভব—প্রসার

১৯৪৫-৪৬ সালের মধ্যে মিত্র জোটের সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক ভেঙে পড়তে শুরু করে। মার্কিন জোট এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন পরস্পরের বিরুদ্ধে আগ্রাসী নীতি গ্রহণের অভিযোগ আনে। প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ৫ মার্চ ১৯৪৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে একটি ভাষণে বলেন :

"বল্টিক অঞ্চলের স্টেটন থেকে এড্রিয়াটিক অঞ্চলের ট্রাস্টে পর্যন্ত মহাদেশের মাঝামাঝি এক লৌহ যবনিকা নেমে এসেছে। সেই যবনিকার পেছনে মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপের প্রাচীন রাষ্ট্রগুলির সব রাজধানী অবস্থিত। ওয়ারশ, বার্লিন, প্রাগ, ভিয়েনা, বুদাপেস্ট, বেলগ্রেড, বুখারেস্ট এবং সোফিয়ার মতো বিখ্যাত শহরগুলি তাদের জনগণসমেত, সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে এবং সবার ওপর কোনো না কোনোভাবে মস্কোর নিয়ন্ত্রণ ক্রমবর্ধমান।"[১]

এই ভাষণের উত্তরে প্রাভদা (Pravda) সংবাদপত্রে ১৩ মার্চ ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত একটি সাক্ষাতকারে স্তালিন, মার্কিন এবং ব্রিটিশ সরকারের ওপর সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করার অভিযোগ করেন।

এই দ্বন্দ্ব উভয় পক্ষের মধ্যে এক ক্ষমতা বিস্তারের প্রতিযোগিতার জন্ম দেয়। এই দ্বন্দ্বের সূচনা প্রথম লক্ষ করা যায় তিনটি অঞ্চলে ইরান, তুরস্ক এবং গ্রীস।

১১.৫.১ ইরান, গ্রীস এবং তুর্কী সংকট

ইরান—বিশ্ব রাজনীতির মানচিত্রে ইরান সহ পশ্চিম এশিয়ার গুরুত্ব প্রধানত তার অবস্থান এবং খনিজ সম্পদের জন্য। এর ফলে উনবিংশ খ্রিস্টাব্দ থেকেই ঔপনিবেশিক দেশগুলি ইরানের ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি করার চেষ্টা শুরু করে, যাদের মধ্যে অন্যতম ছিল ব্রিটেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৪৭ সালে রাশিয়ায় রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে ব্রিটেন ইরানের ওপর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে সম্মত হয়। ১৯৩০-এর দশকে অবশ্য জার্মানি ইরানের ওপর নিজস্ব প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। এর ফলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময় সোভিয়েত-ব্রিটিশ বাহিনী যৌথভাবে ইরানের সৈন্য প্রেরণ করে। ১৯৪২ সালে একটি চুক্তি অনুসারে উত্তর ইরানে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয় এবং দক্ষিণ ইরানে ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির মুখে অবশ্য সোভিয়েত-ব্রিটিশ সম্পর্কের দ্রুত অবনতি হয়। ইরানের সম্রাট রেজা পহ্লাভী নিজে ব্রিটেন এবং আমেরিকার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষে ছিলেন। তাঁর আমলে মার্কিন এবং ব্রিটিশ তেল কোম্পানিগুলি ইরানে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অধিকার কায়েম করতে শুরু করে।

১. তথ্যসূত্র : মার্টিন মেকলে—'দ্য কোলড ওয়ার এ্যাজ হিস্ট্রি (ডকুমেন্ট নং ১৯) (পৃ. ১৩২)।

ইরানে মার্কিন এবং ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পাওয়ায় স্তালিন শঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং উত্তর ইরানে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ বাড়াবার উদ্যোগ নেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরানের কাছে অধিক অর্থনৈতিক অধিকার দেবার দাবি জানাতে শুরু করে। অপরদিকে, স্তালিন উত্তর ইরানে 'তুদিয়া পার্টি' (Tudea Party) নামে একটি রাজতন্ত্র বিরোধী বিচ্ছিন্নতাপন্থী গোষ্ঠীকে মদত দিতে শুরু করেন। ইরানের সরকার এই চাপের সামনে নতিস্বীকার করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে একটি নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করতে রাজি হয়। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে মার্কিন সরকার সোভিয়েত নীতির বিরোধিতা করতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড মার্কিন চাপের মুখে ইরান থেকে সোভিয়েত সেনা ফেরত আসে। ইরান অচিরেই পারস্য উপসাগর অঞ্চলে অন্যতম মার্কিন ঘাঁটি হয়ে উঠে।

গ্রীস—ইরানের মতন গ্রীসেও মার্কিন সোভিয়েত দ্বন্দ্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে শুরু হয়। গ্রীসে নাৎসী বিরোধী আন্দোলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী যৌথভাবে অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে দুটি গোষ্ঠী ছিল—রাজতন্ত্রী গোষ্ঠী এবং কমিউনিস্ট গোষ্ঠী। ১৯৪৪-৪৫ সালে এই দুই গোষ্ঠীর বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে। ব্রিটেনের তত্ত্বাবধানে ১৯৪৫ সালে গ্রীসে উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং নতুন নির্বাচনের আগে একটি অস্থায়ী নজরদারি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

অস্থায়ী নজরদারি সরকার অবশ্য প্রথম থেকেই কমিউনিস্ট বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে। ফলে, কমিউনিস্ট গোষ্ঠী ১৯৪৫ সালের শান্তি চুক্তি মানতে অস্বীকার করে। ইতিমধ্যে ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচন এবং গণভোটে গ্রীসে রাজতন্ত্রী গোষ্ঠীরা জয়লাভ করে। গ্রীসে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। অপরদিকে, কমিউনিস্ট গোষ্ঠী গ্রীসের নতুন নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে।

গ্রীসের গেরিলা যুদ্ধ অচিরেই বিশ্বরাজনীতিতে এক সংকটের সূচনা করে। পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রী দেশগুলি বিশেষত যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীসের কমিউনিস্ট গোষ্ঠীকে প্রচুর সাহায্য প্রদান করে। অপরদিকে এই সাহায্য বন্ধ করার লক্ষ্যে মার্কিন চাপ বাড়তে থাকে। মূলত এই কারণেই স্তালিন নিজে গ্রীসের কমিউনিস্ট গোষ্ঠীকে সেভাবে সাহায্য করতে পারেননি। সোভিয়েত সাহায্যের অপ্রতুলতার কারণে ১৯৪৯ সালে গ্রীসের কমিউনিস্ট বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে দমিত হয়।

তুরস্ক—এশিয়া এবং ইউরোপের মধ্যে সংযোগ সূত্র হিসেবে তুরস্কর গুরুত্ব অপরিসীম। স্থলপথ ছাড়া এই অঞ্চলের সামুদ্রিক খাঁড়িগুলি নৌযাত্রা এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সামুদ্রিক খাঁড়ির মধ্যে অন্যতম হল তুর্কী নিয়ন্ত্রিত 'দার্দেনেলস' (Dardanelles) খাঁড়ি, যা কৃষ্ণসাগর এবং ভূমধ্যসাগরের মধ্যে সংযোগ সূত্র হিসেবে কাজ করে।

তুর্কী সংকটের সূচনা হয় এই প্রণালীর ওপর নিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন তুরস্ক সরকারি নীতি হিসেবে নিজেকে নিরপেক্ষ ঘোষণা করলেও কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে মিত্র-জোটকে দার্দেনেলস খাঁড়ি ব্যবহার করতে না দিলেও গোপনে অক্ষ-শক্তির নৌবাহিনীকে এই খাঁড়ি ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে মার্কিন এবং সোভিয়েত সরকার উভয়েই তুর্কী সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে। এই সুযোগে স্তালিন তুরস্কর ওপর সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ বিস্তারে সচেষ্ট হন। দার্দেনেলস খাঁড়ির ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং তুরস্কতে সোভিয়েত সৈন্য ঘাঁটি স্থাপনের দাবি জানানো হয়। এই দাবি রূপায়ণের লক্ষে স্তালিন তুর্কী সীমান্তের কাছে সৈন্যবাহিনীও প্রেরণ করেন।

এই নীতির বিরুদ্ধে মার্কিন সরকারও পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করে। ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ সালে পূর্ব ভূমধ্যসাগর

অঞ্চলে বিশাল মার্কিন বাহিনী প্রেরিত হয়। মার্কিন চাপের কাছে নতি স্বীকার করে স্তালিন সেনা প্রত্যাহার করে নেন।

এই তিনটি ঘটনা মার্কিন সোভিয়েত দ্বন্দ্বকে একটি আলাদা মাত্রা এনে দেয়। মার্কিন সরকার সোভিয়েত আগ্রাসনের মোকাবিলায় একটি মজবুত ব্যবস্থা রূপায়ন করে।

১১.৫.২ ঠান্ডা যুদ্ধের প্রসার : ইউরোপ

১৯৪৬-৪৭ সালের মধ্যে মার্কিন সরকারের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে যুদ্ধবিধ্বস্ত পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির পক্ষে ইউরোপে 'সোভিয়েত আগ্রাসন' বা কমিউনিস্ট বিপ্লবের মোকাবিলা করা সম্ভব না। প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদী দেশ ব্রিটেন সরকারিভাবে তাদের প্রাক্তন অধিকৃত অঞ্চলগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিতে মার্কিন সরকারের কাছে আবেদন করে। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান, ইউরোপে মার্কিন সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মার্কিন কংগ্রেসে প্রদত্ত ১১ মার্চ ১৯৪৭ সালের একটি ভাষণে ট্রুম্যান তাঁর এই নীতি সুস্পষ্ট করে দেন। তিনি বলেন :

"আমার মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবশ্যই সেই নীতি গ্রহণ করা উচিত যা, স্বাধীনতাকামী মানুষদের বাইরের নিয়ন্ত্রণ বা সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে মোকাবিলায় সাহায্য করবে। দারিদ্র্য এবং অভাব স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র পত্তনের বীজ রোপন করে ... মানুষের মনে উন্নত জীবনের স্বপ্নের যখন মৃত্যু হয় তখন এই বীজগুলি মহীরূহে রূপান্তরিত হয়। তাই আমাদের এই স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার।"[২]

'ট্রুম্যান নীতি' অনুযায়ী মার্কিন স্বরাষ্ট্র সচিব জর্জ মার্শাল (George Marshall) ৫ জুন ১৯৪৭ সালে ইউরোপের দেশগুলিকে একগুচ্ছ অর্থনৈতিক অনুদান দেবার কথা ঘোষণা করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিকে 'মার্শাল নীতি' (Marshall Plan) গ্রহণে বাধা দেওয়ায় এই নীতি মূলত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

মার্কিন নীতির ফলে শঙ্কিত স্তালিন পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে নিজের নিয়ন্ত্রণ আরো বৃদ্ধি করতে শুরু করেন। ১৯৪৭ সালে 'কমিউনিস্ট ইনফরমেশন ব্যুরো' বা কমিনফর্ম (COMINFORM) প্রতিষ্ঠিত হয়। পোল্যান্ড সহ অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণের মাত্রা আরো বৃদ্ধি করা হয়। যুগোশ্লাভিয়ার নেতা টিটো এই নীতির বিরোধিতা করলে যুগোশ্লাভিয়াকে কমিনফর্ম থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। মার্শাল নীতির অনুকরণে সোভিয়েত তত্ত্বাবধানে পূর্ব ইউরোপে 'কমেকন' (COMECON) বলে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে।

১৯৪০-এর দশকে ঠান্ডা যুদ্ধের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে জার্মানির ভবিষ্যত কেন্দ্র করে। ১৯৪৫ থেকে পূর্ব জার্মানি সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণাধীন এবং পশ্চিম জার্মানি মার্কিন এবং ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য জার্মানিকে দীর্ঘসময় এইভাবে দুর্বল করে রাখার পক্ষপাতি ছিল না। তাই ১৯৪৭ সালে ব্রিটেন এবং আমেরিকা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকাগুলি একত্রভাবে শাসন করা শুরু করে। কিছু পরে ১৯৪৮ সালে ফ্রান্সও নিজের নিয়ন্ত্রিত এলাকা ইঙ্গ-মার্কিন এলাকার সঙ্গে সংযোজিত করে। পশ্চিম জার্মানিতে নানাবিধ সংস্কার এবং গণতান্ত্রিক শাসনের কাঠামো গড়া শুরু হয়।

২. তথ্যসূত্র : মার্টিন মেকলে—'কোলড ওয়ার এ্যাজ হিস্ট্রী' (ডকুমেন্ট নং ২৪) (পৃ. ১৩৮)

এর ফলে সোভিয়েত ও মার্কিন মনোমালিন্য চরম পর্যায় পৌঁছায়। ১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসে স্তালিনের নির্দেশে পশ্চিম বার্লিন অবরোধ শুরু হয়। স্তালিনের ধারণা হয় যে অবরোধের ফলে মিত্র-জোট রাজধানী বার্লিন শহর সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করবে এবং তাদের জায়গায় কমিউনিস্ট গোষ্ঠী সম্পূর্ণ বার্লিন শহর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হবে।স্তালিনের এই আশা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। সোভিয়েত অবরোধের মোকাবিলায় মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান বিমান বাহিনীর সাহায্যে পশ্চিম বার্লিনের অবরুদ্ধ নাগরিকদের খাদ্য ও অন্যান্য সাহায্য পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেন। প্রায় এগারো মাস ধরে মার্কিন ও ব্রিটিশ বিমানবাহিনী খাদ্য, তেল, কয়লা ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু পশ্চিম বার্লিনে পৌঁছে দেয়। অবশেষে বিফল মনোরথ হয়ে স্তালিন ১৯৪৯ সালের মে মাসে অবরোধ তুলে নেন।

বার্লিন অভিজ্ঞতা ঠান্ডা যুদ্ধের দ্বন্দ্বকে এক নতুন মাত্রা দেয়। উভয় শক্তিই ইউরোপে নিজেদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়। মার্কিন তত্ত্বাবধানে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিকে নিয়ে ১৯৪৯ সালে 'নেটো' (NATO) প্রতিষ্ঠিত হয়। সোভিয়েত নিয়ন্ত্রিত পূর্ব ইউরোপীয় শক্তি জোট 'ওয়ারস গোষ্ঠী' (Warsaw Pact) স্থাপিত হয় ১৯৫৫ সালে।

উভয় শক্তিই নিজেদের আণবিক শক্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতেও সচেষ্ট হয়। ১৯৪৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম পরমাণু শক্তিধর দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের পরিচালিত গুপ্তচরদের দ্বারা অবশ্য আণবিক অস্ত্র বানাবার কৌশল করায়ত্ব করে এবং ১৯৪৯ সালে প্রথম সোভিয়েত পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষিত হয়। এর প্রত্যুত্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৫২ সালে হাইড্রোজেন বোমার সফল পরীক্ষা ঘটায়। এর পরের বছরই অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৫৩ সালে সফলভাবে নিজেদের হাইড্রাজেন বোমার পরীক্ষা ঘটায়। ব্রিটেন ১৯৫২ সালে পরমাণু শক্তিধর দেশ হয়ে ওঠে।

১১.৫.৩ ঠান্ডা যুদ্ধের প্রসার : এশিয়া

মার্কিন-সোভিয়েত দ্বন্দ্ব ইউরোপ ছাড়াও বিশ্ব মানচিত্রের অন্যান্য জায়গাতেও এর প্রভাব ফেলতে শুরু করে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল এশিয়া মহাদেশ। এশিয়াতে এসময় প্রাক্তন উপনিবেশগুলিতে ভাঙন ধরার এক প্রক্রিয়া চলছিল। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এই লড়াই মূলত আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ থেকে উদ্ভুত হলেও কোনো কোনো অঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রভাব লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপনিবেশবাদের বিপক্ষে হলেও এশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রসারের বিপক্ষে ছিল। এর ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে ঠান্ডা যুদ্ধের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা হয় এশিয়াতে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলগুলিতে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রসার রুদ্ধ করা। যেমন, ফিলিপিনসকে ১৯৪৬ সালে স্বাধীনতা দিলেও মার্কিন আধিপত্য সেখানে বজায় থাকে। জাপানে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত মার্কিন তত্ত্বাবধান জারি থাকে। ১৯৪৯ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণ করতে দিলেও ১৯৫০ সালে কোরীয় যুদ্ধ শুরু হওয়ায় কমিউনিস্ট দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এর জবাবে অন্যান্য মিত্র জোটের সদস্য দেশগুলি জাপানের সঙ্গে ১৯৫১ সালে সানফ্রানসিসকো চুক্তি অনুসারে শান্তি স্থাপন করলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন তা করতে অস্বীকার করে।

১৯৪৯ সালে মাও সে তুঙের নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন আত্মপ্রকাশ করলে এশিয়াতে ঠান্ডা যুদ্ধ এক নতুন মাত্রা লাভ করে। অচিরেই ১৯৫০ সালে চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত

হলে মার্কিন সরকার এশিয়াতে 'কমিউনিস্ট আগ্রাসন' সম্বন্ধে আরো শঙ্কিত হয়ে পড়ে। মার্কিন সরকারের তরফে যেকোনো উপায়ে এই বিস্তার রোধ করার চেষ্টা হবে বলে ঘোষণা করা হয়। এর ফলে ১৯৫০-এর দশকে কোরীয় যুদ্ধ এবং ইন্দো-চীন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ঠান্ডা যুদ্ধ এক নতুন মাত্রা লাভ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে কোরিয়া দুই ভাগে বিভাজিত হয়। উত্তর কোরিয়ায় সোভিয়েত (এবং পরবর্তীকালে চীন) প্রস্তাবিত কমিউনিস্ট সরকার স্থাপিত হয় এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন প্রভাবিত গণতান্ত্রিক সরকার স্থাপিত হয়। ৩৮° দ্রাঘিমা উত্তর এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সীমান্ত রূপে গণ্য হয়। ১৯৫০ সালে উত্তর কোরীয় বাহিনী দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবেশ করলে কোরীয় যুদ্ধ শুরু হয় যা চার বছর ধরে (১৯৫০-৫৪) চলে। উত্তর কোরিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মূলত চীনের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সামরিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সাহায্য লাভ করে। অপরদিকে রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে মার্কিন সৈন্যবাহিনী দক্ষিণ কোরিয়াকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়। ১৯৫১ সালের মধ্যে উত্তরকোরিয়ার সৈন্যবাহিনীকে দক্ষিণ কোরিয়ার অঞ্চলগুলি থেকে বের করে দিতে মার্কিনী বাহিনী সক্ষম হয়। মার্কিন সেনাপতি ডগলাস ম্যাক আর্থার এক পরবর্তী ধাপ হিসেবে উত্তর কোরিয়া এবং চীনে কমিউনিস্ট সরকারের অপসারণ চাইলেও রাষ্ট্র সংঘ এবং অন্যান্য মিত্র দেশগুলির আপত্তিতে মার্কিন সরকার এই নীতি গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৩ সালে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা হয় এবং ১৯৫৪ সালে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

অপর অঞ্চল, যেখানে ঠান্ডা যুদ্ধের প্রভাব লক্ষণীয় হয়, তা হল ইন্দো-চীন অঞ্চল। ইন্দো-চীন অঞ্চলের তিনটি রাজা আন্নাম, টংকিং এবং কোচিন-চীন উনবিংশ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি উপনিবেশে রূপান্তরিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন এই অঞ্চলটি জাপান কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর এই অঞ্চলটিতে কমিউনিস্ট নেতা হো চি মিন (Ho Chi Minh)-এর নেতৃত্বে একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রয়াস চালানো হয়। ফরাসি সরকার অবশ্য এইপ্রচেষ্টাকেস্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। যার ফলে, নতুন গঠিত ভিয়েতমিন (Vietminh) রাষ্ট্রের সঙ্গে ফ্রান্সের সংঘর্ষ শুরু হয়। ফরাসি সৈন্যবাহিনী অবশ্য কমিউনিস্ট গোষ্ঠীকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয় এবং দিয়েন বিয়েন ফুর (Dien Bien Phu) যুদ্ধে (১৯৫৪) ভিয়েতমিন সৈন্যবাহিনীর হাতে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হয়। এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় শান্তি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় পক্ষকে আলোচনায় অংশ নিতে আহ্বান জানায়। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৪ সালের জেনিভা চুক্তি অনুসারে ভিয়েতনাম স্বাধীনতা লাভ করে। এছাড়া, ভিয়েতনামও দুই ভাগে বিভাজিত হয়। উত্তর ভিয়েতনামে হো চি মিন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবংদক্ষিণ ভিয়েতনামে একটি মার্কিন প্রভাবিত সরকার স্থাপিত হয়। এছাড়া, হো চি মিনের কমিউনিস্ট সেনারা লাওস এবং কাম্বোডিয়া অঞ্চলে নিজেদের অধিকৃত এলাকা ছেড়ে দেয়।

ভিয়েতনাম সমস্যা অবশ্য শীঘ্রই আরো তীব্র হয়ে ওঠে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন সরকার প্রথমে বাও দাই সরকার এবং ১৯৫৫ সালে রাষ্ট্রপতি দিয়েম দ্বারা গঠিত সরকারকে সমর্থন জারি রাখে। কিন্তু এই সরকার নানা প্রকার দুর্নীতি এবং অপশাসনের ফলে জনসাধারণের কাছে অপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণ ভিয়েতনামে এক 'ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করে এবং ভিয়েতকং (Vietcong) নামক এক গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলে দিয়েম সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়। ১৯৬৩ সলে দিয়েম আততায়ীর হাতে নিহত হলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। মার্কিন সরকারের কাছে এই ঘটনা প্রবাহ সমাজতান্ত্রিক আগ্রাসন রূপে গণ্য হয় এবং ভিয়েতনামে মার্কিন সৈন্যবাহিনী সুদীর্ঘ সময়

ধরে ভিয়েতকঙের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। মার্কিন সৈন্যবাহিনীর নির্বিচার হত্যালীলার ফলে উত্তর এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম মিলিয়ে কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। কিন্তু মার্কিন সৈন্যবাহিনীর এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর বিস্তার রোধ করা সম্ভবপর হয়নি। অবশেষে ১৯৭২-৭৩ সালে মার্কিন সৈন্যবাহিনী ভিয়েতনাম ত্যাগ করে। ১৯৭৫ সালে দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী সায়গনের পতন হয় এবং ১৯৭৬ সালে ভিয়েতনামে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভিয়েতনাম ছাড়া দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল, যেমন কাম্বিডিয়া ও লাওসে দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের পর কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া, কমিউনিস্ট বিস্তার বন্ধের উদ্দেশ্যে 'সিয়েটো' (SEATO—South East Asia Treaty Organisation) এবং 'সেনটো' (CENTO—Central Treaty Organisation) স্থাপন করা হয়।

১১.৫.৪ পূর্ব-পশ্চিম সম্পর্কের উন্নতি (Detenté) এবং নতুন ঠান্ডা যুদ্ধ

১৯৫০-এর দশকে ঠান্ডা যুদ্ধ তীব্র হলেও এই রেষারেষি বন্ধের চেষ্টাও অব্যাহত থাকে। ১৯৫০-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন সম্মেলনে যৌথভাবে অংশগ্রহণ করতে থাকায় এই প্রচেষ্টা শুরু হয়। ১৯৫৩ সালে স্তালিনের মৃত্যুর পর এই প্রচেষ্টা নতুন মাত্রা লাভ করে। নতুন সোভিয়েত নেতা ক্রুশ্চেভ (Khruschev) ১৯৫৬ সালে পূর্ব-পশ্চিম 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান'-এর কথা ঘোষণা করেন। বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দ্বিপাক্ষিক বা যৌথভাবে আলোচনার দ্বারা সমাধানের কথাও বলা হয়। ১৯৫৬ সালে ক্রুশ্চেভ এবং প্রধানমন্ত্রী লণ্ডন সফরে যান। ১৯৫৯ সালে ক্রুশ্চেভ এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার (Eisenhouer) ক্যাম্প ডেভিড শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হন। ১৯৬১ সালে ক্রুশ্চেভ পুনরায় নতুন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জন কেনেডির (John Kennedy) সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন।

সম্পর্কের উন্নয়ন বা 'Detenté' অবশ্য পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে মেটাতে সক্ষম হয়নি। ১৯৫০-১৯৭০-এর মধ্যে বিশ্ব রাজনীতিতে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা, সম্পর্ককে আরো বিষিয়ে তুলেছিল। ১৯৬০ সালে প্যারিসে, মার্কিন-সোভিয়েত ছাড়া ব্রিটেন এবং ফ্রান্সকে নিয়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলন প্রহসনে পরিণত হয় যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের এলাকায় একটি মার্কিন গুপ্তচর বিমান গুলি করে নামিয়ে বিমানচালক গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর ফলে, ক্রুশ্চেভ প্রথমে মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা দাবি করেন এবং মার্কিন সরকার ক্ষমা প্রার্থনা করতে অস্বীকার করলে তিনি এই বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে যান। এছাড়া পশ্চিম জার্মানি 'নেটো'র সদস্যপদ গ্রহণ করলে তিনি সেটা খারিজ করার দাবি জানাতে থাকেন।

১৯৬০-এর দশকে বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঠান্ডা যুদ্ধ আবার জোরালো হয়ে ওঠে। নতুন মার্কিন রাষ্ট্রপতি কেনেডি ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর বিরোধিতায় মার্কিন সামরিক সাহায্য আরো জোরদার করেন। এছাড়া, ১৯৬০ সালে কঙ্গো স্বাধীন হলে, সেখানে রাষ্ট্রপতি লুমুম্বা (Lumumba) এবং সামরিক নেতা মোবুটু (Mobutu)-র দ্বন্দ্বের ফলে কঙ্গোয় গৃহযুদ্ধ শুরুহয়। লুমুম্বা সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী হওয়ায় রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে মার্কিন সমর্থন মূলত মোবুটুর পক্ষেই থাকে। মার্কিন সাহায্যে উৎসাহিত হয়ে মোবুটু ১৯৬১ সালে লুমুম্বাকে হত্যা করে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত করেন।

মার্কিন-সোভিয়েত দ্বন্দ্বের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে কিউবার সমস্যাকে কেন্দ্র করে। ফিদেল কাস্ত্রোরনেতৃত্বে কিউবায় কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চেষ্টা চালায় এই সরকারকে উৎখাত করার। কেনেডির তত্ত্বাবধানে বে অফ পিগ্‌স অঞ্চলে সামরিক চাপ বিফল হয়। ১৯৬০-এর দশকে সোভিয়েত-কিউবা

সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। ১৯৬২ সালে মার্কিন সরকার চাঞ্চল্যকরভাবে প্রমাণসহ কিউবায় সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়বার বেদী তৈরির খবর প্রকাশ করে। কেনেডি অবিলম্বে এই নির্মাণ কার্য বন্ধ করার দাবি জানান। ১২ অক্টোবর ১৯৬২ সালে কিউবায় মার্কিন নৌ অবরোধ গড়ে ওঠে এবং প্রয়োজন হলে সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার জন্যে কেনেডি যুদ্ধের হুমকিও দেন। শেষ পর্যন্ত, ক্রুশ্চেভ কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি সরিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নেন। বদলে মার্কিন সরকার কাস্ত্রোকে গদিচ্যুত করা থেকে বিরত থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়।

কিউবার সমস্যা বিশ্ববাসীকে ঠান্ডা যুদ্ধের বিপদ সম্বন্ধে পুনরায় অবহিত করে। জনমতের চাপে দুই বিশ্বশক্তি পুনরায় শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হতে শুরু করে। ১৯৬২ সালে জেনিভায় একটি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে মার্কিন-সোভিয়েত 'হটলাইন' স্থাপিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৬৩ সালে পরমাণু শক্তিধরদেশগুলি আংশিক পরীক্ষা বন্ধের ঘোষণা করে। ১৯৬৭ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জনসন এবং সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন একটি শিখর সম্মেলনে মিলিত হন।

১৯৭০-এর দশকে মার্কিন-সোভিয়েত সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। এর অন্যতম কারণ ছিল চীন-মার্কিন সম্পর্কের উন্নয়ন এবং চীন-সোভিয়েত সম্পর্কের অবনতি। এর ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে আরো আগ্রহী হয়ে ওঠে। পশ্চিমী দুনিয়ার কিছু অন্যান্য নেতাও (যেমন পশ্চিম জার্মানির নেতা উইলি ব্র্যান্ড Willy Brandt) এই সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য চেষ্টা চালান। এই সব প্রচেষ্টার প্রতিফলন ঘটে মার্কিন-সোভিয়েত বিভিন্ন সামরিক যুদ্ধাস্ত্র সংবরণ ও নিবারণ চুক্তিতে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সন নিজে মস্কো সফরে যান। ১৯৭২ সালে SALT-I (Strategic Arms Limitation Treaty) চুক্তির মাধ্যমে উভয় পক্ষই ক্ষেপণাস্ত্রের সংখ্যা কমানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এছাড়া, ১৯৭৯ সালে মার্কিন সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী চীনকে সরকারি স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭৪ সালে নিক্সন সরকার পূর্ণ জার্মানির সরকারকেও স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭৫ সালে হেলসিঙ্কি শহরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মার্কিন সোভিয়েত সহ প্রায় ৩৪টি দেশের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন ভরসা বৃদ্ধি নীতি (Confidence Building Measures) গ্রহণ করা হয়। এছাড়া মহাকাশ গবেষণায় মার্কিন-সোভিয়েত সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

১৯৮০-র দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্থানে সেনা প্রেরণ করে সেখানে একটি সোভিয়েত প্রভাবিত সরকার স্থাপন করলে ঠান্ডা যুদ্ধের নতুন পর্যায় শুরু হয়। অনেকে এই নতুন পর্যায়কে 'নতুন বা নব্য ঠান্ডা যুদ্ধ' বলেন। ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক আফগানিস্থানে সৈন্য প্রেরণের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগন (Ronald Reagan) পুনরায় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করেন। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'অশুভ সাম্রাজ্য' বলে অভিহিত করেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে কমিউনিস্ট আগ্রাসন সক্রিয়ভাবে রোধ করবার নীতি গ্রহণ করেন। এই লক্ষ্যে বহু ক্ষেত্রে মার্কিন সরকার প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী শক্তিগুলিকে সাহায্য করতে শুরু করে। যেমন, আফগানিস্থানে, পাকিস্থানের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যম মার্কিন সাহায্য ইসলামী মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলির হাতে পৌঁছতে শুরু করে। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সামরিক নেতা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বৈরতান্ত্রিক সরকারগুলিকে সমর্থন জানানো হয়।

১১.৫.৫ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান

১৯৮০-র দশকের দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য ঠান্ডা যুদ্ধ সংক্রান্ত রেষারেষির অনেকখানি পরিসমাপ্তি ঘটে। এই রেষারেষি পরিসমাপ্ত করার মূল উদ্যোগ নেন তৎকালীন সোভিয়েত রাষ্ট্রপতি মিখাইল গোর্বাচেভ (Mikhail Gorbachev)।

মূলত তাঁর দুটি নীতি গ্লাসনস্ত (Glassnost) এবং পেরেসট্রোইকা (Parestroika)-র ওপর ভিত্তি করে। এর মূল লক্ষ্য ছিলসোভিয়েত ইউনিয়নে অভ্যন্তরীণ সংস্কার। এছাড়া মার্কিন সরকারের সঙ্গেও গোর্বাচেভ সহযোগিতার রাস্তা নেন। এর ফলে অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়নে অভ্যন্তরীণ ভাঙন দেখা যায় এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪৫ সাল থেকে চলে আসা ঠান্ডা যুদ্ধের সমাপ্তি হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞ ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার (Francis Fukuyama) মতে ঠান্ডা যুদ্ধের সমাপ্তি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হল 'ইতিহাসের সমাপ্তি' ('End of History')। এর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান হলেও, ১৯৯১ সালের ঘটনাপ্রবাহ যে যুগান্তকারী ঘটনা এটা অস্বীকার করা যায় না।

১১.৬ ঠান্ডা যুদ্ধ উদ্ভবের দায়িত্ব

ঠান্ডা যুদ্ধ উদ্ভবের ব্যাখ্যা ঐতিহাসিক এবং সমাজবিজ্ঞানী মহলে বিভিন্নভাবে করার চেষ্টা করা হয়েছে। ১৯৪০ এবং ১৯৫০-এর দশকে, পশ্চিমী লেখককুল ঠান্ডা যুদ্ধ উদ্ভবের জন্য মূলত সোভিয়েত আগ্রাসী নীতিকেই দায়ী করেন। জর্জ কেনান (George Kennan) হিউ সেটন ওয়াটসন (Hugh Setton Watson) প্রভৃতি সমালোচকদের মতে 'মার্কস-লেনিনবাদ', 'সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্লব' এবং 'স্তালিনের আগ্রাসী নীতি' সব মিলিয়ে পশ্চিমী দেশগুলিকে শঙ্কিত করে তোলে। এই আগ্রাসন রোধ করার লক্ষ্যে মার্কিন নীতি প্রণয়ন ঠান্ডা যুদ্ধকে তীব্র করে তোলে।

এই ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার প্রথম বিরোধিতা করেন নব্য বামপন্থী সমালোচকরা। এ্যালপেরোভিটজ্ (Alperovitz), গেব্রিয়েল কলকো (Kolko) প্রভৃতি নব্য বামপন্থী লেখকরা ঠান্ডা যুদ্ধের জন্য মূলত মার্কিন নীতিকেই দায়ী করেন। এঁদের মতে ১৯৪৫-এর পরবর্তীকালে সোভিয়েত সরকার মূলত তার নিজস্ব সুরক্ষা নিয়েই ব্যস্ত ছিল। মার্কিন আগ্রাসী নীতি এই সুরক্ষা নীতিকে আরো দৃঢ় করে তোলে এবং এই লক্ষেই স্তালিন পূর্ব ইউরোপের ওপর সোভিয়েত কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করেন। পশ্চিম ইউরোপ বা বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে, সমাজতান্ত্রিক প্রভাব বিস্তারের লক্ষ তাঁদের ছিল না।

১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে একদল নতুন লেখককুলের সৃষ্টি হয়েছে যারা 'উত্তর সংশোধনবাদী' (Post Revisionist) বলে পরিচিত। মার্টিন মেকলে প্রভৃতি লেখক এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই গোষ্ঠী কোনো এক বিশেষ দেশ বা সরকারকে দায়ী না করে, ঠান্ডা যুদ্ধকে একটি বহুমাত্রিক ঘটনাপ্রবাহ বলে অভিহিত করেন, যার পেছনে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও নীতি কাজ করেছিল। এঁরা উভয় দেশেরই সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীকুলকে ঠান্ডা যুদ্ধ আরম্ভ ও বিস্তার করবার জন্য দায়বদ্ধ করেন। উভয় দেশেরই মূল লক্ষ্য ছিল, বিশ্বব্যাপী নিজেদের নিয়ন্ত্রণ জারি করা এবং এই লক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক ত্রায় বেশি সাফল্য লাভ করে। ক্ষমতার দখল ও নিয়ন্ত্রণের নেশাই এই ঠান্ডা যুদ্ধের উদ্ভবের জন্য মূলত দায়ী।

১১.৭ সারাংশ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপট ছিল ঠান্ডা যুদ্ধ নির্ধারিত। ঠান্ডা যুদ্ধের মূল সংজ্ঞা হল এক দীর্ঘমেয়াদী দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক, যা আপাত শান্তির আড়ালে রেষারেষি বজায় রাখে। ঠান্ডা যুদ্ধ কথাটির ব্যবহার

ইতিহাসে পূর্বে করা হলেও এর ব্যবহার মূলত ১৯৪৫ সালের পরবর্তীকালে বিশ্বরাজনীতিতে মার্কিন-সোভিয়েত দ্বন্দ্ব বোঝাতে করা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে মার্কিন-সোভিয়েত দ্বন্দ্বের সূচনা হয় ইরান, তুরস্ক ও গ্রীসকে কেন্দ্র করে। পরে, ট্রুম্যান-নীতি ও মার্শাল-পরিকল্পনা রূপায়ণ হলে স্তালিন পূর্ব ইউরোপে নিজের আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হন। বার্লিন অবরোধ, ন্যাটো ও ওয়ারশ গোষ্ঠী স্থাপন ইত্যাদির মাধ্যমে এই দ্বন্দ্ব আরো তীব্র হয়ে ওঠে।

এশিয়ায় কোরীয় যুদ্ধ এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ তীব্র হয়ে ওঠে।

১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশকে একদিকে যেমন সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা চলে অপরদিকে কিউবা, কঙ্গো ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে ঠান্ডা যুদ্ধ চলতে থাকে।

১৯৮০-এর দশকে রেগনের সময় নতুন করে ঠান্ডা যুদ্ধ আরো তীব্র ভাবে শুরু হয়। ১৯৮০-র শেষার্ধে গোর্বাচেভের নেতৃত্বে সম্পর্কের আবার উন্নয়ন ঘটে।

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান হয়।

১১.৮ অনুশীলনী

১. ইরান, গ্রীস এবং তুরস্কের সংকটের বিবরণ দিন।
২. ঠান্ডা যুদ্ধের প্রভাব এশিয়ায় কিভাবে পড়ে?
৩. 'Detenté' বলতে কি বোঝেন?
৪. ঠান্ডা যুদ্ধের জন্য কে বেশি দায়ী বলে আপনি মনে করেন?
৫. ন্যাটো কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
৬. SALT-I চুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়?

১১.৯ উত্তর সংকেত

১. ৩.৫.১ অংশটি দেখুন।
২. ৩.৫.৩ অংশটি দেখুন।
৩. ৩.৫.৪ অংশটি দেখুন।
৪. ৩.৬ অংশটি দেখুন।
৫. ১৯৪৯ সালে।
৬. ১৯৭২ সালে।

১১.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১. পিটার ক্যালভোকোরেসী—'ওয়ার্লড পালিটিকস্ সিনস্ ১৯৪৫' (১৯৬৮)।
২. মার্টিন মেকলে—'কোলড ওয়ার এস্ হিস্ট্রী' (১৯৯৫)।
৩. জ্যাক ওয়াটসন্—'ওয়ার্লড হিস্ট্রী সিনস্ ১৯৪৫' (১৯৮৯)।

একক ১২ ❐ রাষ্ট্রসংঘ : উদ্ভব, কার্যকলাপ এবং শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টা

গঠন

১২.১ উদ্দেশ্য
১২.২ প্রস্তাবনা
১২.৩ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে শান্তিরক্ষার যৌথ প্রচেষ্টা
১২.৪ রাষ্ট্রসংঘের উদ্ভব
১২.৫ রাষ্ট্রসংঘ : প্রাতিষ্ঠানিক প্রকৃতি
১২.৬ রাষ্ট্রসংঘ : বিশ্বশান্তির প্রয়াস
১২.৭ সারাংশ
১২.৮ অনুশীলনী
১২.৯ উত্তর সংকেত
১২.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি যে বিষয়গুলি জানতে পারবেন সেগুলি হল :

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বিশ্বরাজনীতিতে আন্তর্জার্তিক সংগঠন গঠনের প্রয়াস।
- আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে 'লীগ অফ নেশনস'-এর ব্যর্থতা।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন মিত্র-জোটের নতুন আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ার প্রয়াস।
- রাষ্ট্রসংঘের উদ্ভব এবং প্রসার।
- আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষার ভূমিকা।

১২.২ প্রস্তাবনা

বিশ্বরাজনীতি যেমন একদিকে আন্তর্জতিক দ্বন্দ্বের ফলে বারবার বিপদগ্রস্ত হয়েছে, তেমনি অপরদিকে এই দ্বন্দ্বের বিপরীত শক্তি হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যৌথভাবে শান্তিরক্ষার প্রয়াসও করা হয়েছে। কিন্তু আগেকার বেশির ভাগ প্রয়াসই ব্যর্থ হয়েছে। আধুনিক যুগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর (লীগ অফ নেশনস গঠনের মাধ্যমে) একটি বড়ো প্রয়াস চালানো হয়। কিন্তু ১৯৩০ এবং ১৯৪০-এর দশকের দ্বন্দ্বের ফলে এই প্রচেষ্টা ব্যাহত হয় এবং ইউরোপ তথা সারা বিশ্বকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে শান্তিরক্ষার যৌথ প্রয়াস আকার নেয় রাষ্ট্রসংঘ রূপে। এই এককটির অন্যান্য অংশে আপনারা দেখবেন যে ঠান্ডা যুদ্ধ প্রসূত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও রাষ্ট্রসংঘ কিভাবে নিজের সাংগঠনিক প্রক্রিয়া বিস্তারে সক্ষম হয়েছে এবং শান্তিরক্ষার প্রয়াস চালিয়েছে।

১২.৩ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে শান্তিরক্ষার যৌথ প্রচেষ্টা

বিশ্ব রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে যৌথ প্রচেষ্টা নতুন নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে নেপোলিয়নের পতনের পর ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের ভিয়েনা কংগ্রেসে তৎকালীন প্রধান ইউরোপীয় শক্তিগুলি যৌথভাবে ইউরোপে শান্তিরক্ষা এবং বিদ্রোহ দমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এই প্রচেষ্টা অবশ্য নেতিবাচক এবং প্রগতিশীল শক্তিগুলির বিরোধিতা করেছিল বলে বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এদের মূল কাজ ছিল ইউরোপে স্থিতিস্থাপকতা বজায়রাখা এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলির দমন।

যৌথভাবে শান্তিরক্ষার প্রয়াস বিংশ শতাব্দীতে আরো জোরদার হয়ে ওঠে। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকুলের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং প্রতিযোগিতা বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আশঙ্কিত করে তোলে। সাহিত্য, পত্র পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্বশান্তি রক্ষা করবার আবেদন জানানো হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৯) ভয়াবহতা এবং লোকক্ষয়, এই যৌথ শান্তির প্রয়াসে নতুন মাত্রা যোগ করে। আমেরিকার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson) এই প্রয়াসের অন্যতম সমর্থক ছিলেন। মূলত তাঁর প্রচেষ্টায় যুদ্ধ শেষে 'লীগ অফ নেশনস' গড়ে ওঠে।

লীগ অফ্ নেশনস অনেক আশা জাগালেও সেই আশা পূরণে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। প্রথমত, উইলসনের ইচ্ছা থাকলেও মার্কিন সেনেটের বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত মর্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারেনি। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম দিকে পশ্চিমী শক্তিগুলির বিরোধিতায় লীগের সদস্যপদ পায়নি। বহু পরে ১৯৪৩ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন লীগের সদস্যপদ লাভ করে। কিন্তু ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের বিরোধিতার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের নাৎসী জার্মানির বিরুদ্ধে যৌথ সুরক্ষা নীতি ব্যাহত হয়। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন নাৎসী জার্মানির সঙ্গে ১৯৩৯ সালে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। পরবর্তীকালে সোভিয়েত কর্তৃক পোল্যান্ড দখলের পর সোভিয়েত সদস্যপদ কেড়ে নেওয়া হয়। এছাড়া লীগ, ইউরোপে অক্ষশক্তির উত্থান আটকাতে ব্যর্থ হয়। জার্মানি রাইনল্যান্ড অঞ্চলে পুনরায় সামরিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করে ; ইতালি আবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) সেনা প্রেরণ করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং জাপান, উত্তর চীনের মাঞ্চুরিয়া দখল করে। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সময় লীগ-এর সরকারি ভাবে অস্তিত্ব থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তা মৃতপ্রায় হয়ে ওঠে।

১২.৪ রাষ্ট্রসংঘের উদ্ভব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চালকালীন বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সংগঠন গঠনের প্রক্রিয়া আবার নতুন উদ্যমে শুরু হয়। কিন্তু এই নতুন আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রকৃতি সম্বন্ধে মিত্র-জোটের মধ্যে নানা মতবিরোধ দেখা দেয়। রুজভেল্ট এবং চার্চিল প্রথমদিকে আঞ্চলিক সংগঠন সৃষ্টির পক্ষে ছিলেন। স্তালিন অপরদিকে লীগের ন্যায় একটি বিশ্ব সংগঠন গড়ে তোলার পক্ষে ছিলেন। অবশেষে উভয় গোষ্ঠীই আঞ্চলিক সংগঠনের পরিবর্তে একটি বৃহৎ সংগঠন গড়ার পক্ষে মত দেন।

এর আগেই অবশ্য মিত্র-জোটের সদস্যরা পারস্পরিক এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রশ্নে কাছাকাছি আসতে শুরু করে। ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে রুজভেল্ট এবং চার্চিল যৌথভাবে অতলান্তিক ঘোষণার মাধ্যমে

এই ধরনের যৌথ প্রচেষ্টার ওপর জোর দেন। 'অতলান্তিক ঘোষণা'র প্রতি সমর্থন জানিয়ে ছাব্বিশটি দেশ ১ জানুয়ারি ১৯৪১ সালে 'রাষ্ট্রসংঘের ঘোষণা' জারি করে। এর পরে ১৯৪৩ সালে মস্কোতে আয়োজিত মিত্রজোটের বিদেশ মন্ত্রীদের একটি বৈঠকে 'বিশ্ব সংগঠন' গঠনের এই পরিকল্পনা সমর্থন লাভ করে।

এর পরে ১৯৪৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডামবার্টন ওকস্ (Dumbarton Oakes) অঞ্চলে পুনরায় মিত্র-জোটের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এখানে নতুন সংগঠনের জন্য একটি সংবিধানের খসড়া পত্র লেখার কাজ শুরু হয়। এই কাজে অংশগ্রহণ করে চার প্রতিনিধি দেশ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন এবং চীন। এই চার শক্তি নিজেদের এবং ফ্রান্সকে নতুন সংগঠনের সুরক্ষা পরিষদের সদস্যপদ দেয়। এই খসড়াপত্র অবশেষে ১৯৪৫ সালে ইয়াল্টায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে, তিন প্রধান শক্তির (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন) অনুমোদন লাভ করে। ইয়াল্টা সম্মেলনে ঠিক হয় যে, সুরক্ষা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের 'ভিটো' প্রয়োগ করার ক্ষমতা থাকবে। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে স্যান ফ্রানসিস্কো (San Francisco) শহরে একটি বিশাল সম্মেলন আয়োজিত হয়। এতে পঞ্চাশটি দেশ অংশগ্রহণ করে। এই সম্মেলনে অনুমোদিত হবার পর রাষ্ট্রসংঘ আনুষ্ঠানিক পূর্ণতা লাভ করে। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার প্রথম বৈঠক অস্থায়ীভাবে লণ্ডন শহরে অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে রাষ্ট্রসংঘের প্রধান দপ্তর খোলা হয়।

১২.৫ রাষ্ট্রসংঘ : প্রাতিষ্ঠানিক প্রকৃতি

রাষ্ট্রসংঘের ভবিষ্যত কর্মপন্থা সম্বন্ধে সংবিধান ঘোষণা করেছে—

"ভবিষ্যত প্রজন্মগুলিকে যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে বাঁচানো, যা আমাদের জীবদ্দশায় দুবার মানব সভ্যতার সামনে অপরিসীম বেদনা নিয়ে এসেছে।"

এছাড়া রাষ্ট্রসংঘ মানবাধিকার, আন্তর্জাতিক আইন, আর্থ-সামাজিক প্রগতি ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশ্ব জনমত গঠনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছে। এর ফলে, এটি প্রথম থেকেই একটি সুবৃহৎ সংগঠন হয়ে ওঠে।

এই বিশাল সংগঠন পরিচালনার জন্যে এটিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভাগ করা হয়। সব থেকে বৃহৎ সংগঠন হল সাধারণ সভা বা জেনারেল এসেম্বলী। রাষ্ট্রসংঘের প্রতিটি দেশ এই সাধারণ সভার সদস্য এবং প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে হলে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন হয়। অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হল নিরাপত্তা পরিষদ বা সিকিউরিটি কাউন্সিল। সিকিউরিটি কাউন্সিলের চিরস্থায়ী সদস্য সংখ্যা হল পাঁচ। এরা হল—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া (আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন), গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং চীন। এছাড়া সিকিউরিটি কাউন্সিলে ছয়টি অতিরিক্ত সদস্যপদ আছে, যা একেকটি দেশ, দুবছরের জন্য ক্রমপর্যায়ে লাভ করে। মূল ক্ষমতা পাঁচটি স্থায়ী সদস্য দেশগুলির ওপর থাকে এবং 'ভিটো' প্রয়োগের ক্ষমতা এরাই ভোগ করে।

এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন ছাড়া রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সংগঠনগুলি হল 'অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ' বা ইকনমিক এ্যান্ড সোস্যাল কাউন্সিল, 'অছি পরিষদ' বা ট্রাস্টশিপ কাউন্সিল, 'আন্তর্জাতিক আইন পরিষদ' বা ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ্ জাস্টিস'। রাষ্ট্রসংঘ পরিচালিত 'অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ' বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে। এগুলি হল 'ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন', 'ওয়ার্ল্ড

হেলথ অর্গানাইজেশন', 'ইউনাইটেড নেশনস হাই-কমিশনার ফর রিফিউজিস', 'ইউনাইটেড নেশনস ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেনস ইমারজেন্সি ফান্ড', 'ফুড এ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন', 'ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক এ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন', 'ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশনস ইউনিয়ন', 'ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন', 'ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন' এবং 'ওয়ার্ল্ড মেটিরিয়ওলোজিকাল অর্গানাইজেশন'।

এছাড়া ১৯৫৪ সালে ব্রেটন উডস্ চুক্তির দ্বারা সংগঠিত দুটি নতুন সংগঠন—'ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড' এবং 'ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক' রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলে।

এই নানাবিধ কর্মযজ্ঞের প্রধান কাণ্ডারি হিসেবে কাজ করে রাষ্ট্রসংঘের সচিবালয় বা 'সেক্রেট্যারিয়ট'। এর প্রধান হলেন মহাসচিব বা সেক্রেট্যারি জেনারেল। রাষ্ট্রসংঘের প্রথম মহাসচিব ছিলেন নরওয়ের কূটনীতিবিদ্ ট্রীগভী লাই।

১২.৬ রাষ্ট্রসংঘ : বিশ্বশান্তির প্রয়াস

রাষ্ট্রসংঘ মূলত দুই ধরনের কাজকর্মের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে—উন্নয়নমুখী কার্যক্রম এবং আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা। কিন্তু এই দুটি কার্যক্রমের রূপায়নেই রাষ্ট্রসংঘ নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এর মূল কারণ ছিল, বিশ্ব রাজনীতিতে ঠান্ডা যুদ্ধের পটভূমি। অপরদিকে, তৃতীয় বিশ্বের উত্থান এবং 'উত্তর-দক্ষিণ' (North-South) বিরোধ রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়নশীল পরিকল্পনা ব্যাহত করতে শুরু করে।

নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য দেশগুলি বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের ঠান্ডা যুদ্ধ প্রভাবিত মানসিকতার পরিচয় দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ১৯৪৯ সালে চীনে মাও সে তুং ক্ষমতায় এলেও দীর্ঘ সময় ধরে মার্কিন চাপের ফলে চীনের সদস্যপদের দাবি অগ্রাহ্য করা হয়। এমনকি রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে চীনের প্রতিনিধিত্ব করে ফরমোসায় (তাইওয়ান) চিয়াং কাই শেকের নেতৃত্বে কুয়োমিনতাং সরকার। দীর্ঘ সময় পরে ১৯৭১ সালে সম্পর্কের উন্নতির পর মার্কিন সরকার নিরাপত্তা পরিষদে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সদস্যপদের দাবি মেনে নেয়। অপরদিকে 'ভিটো' প্রয়োগ করার প্রবণতা রাষ্ট্রসংঘের কাজকর্মকে তীব্রভাবে ব্যাহত করে।

এসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও রাষ্ট্রসংঘ বিশ্বরাজনীতিতে বিভিন্ন ধরনের সংঘাত এড়াতে পদক্ষেপ নিতে শুরু করে। রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে শান্তিরক্ষার প্রয়াস বিভিন্ন ধারায় বিবর্তিত হয়। দ্বিপাক্ষিক আলোচনা, অনুসন্ধানী দল প্রেরণ, এমনকি সামরিক শান্তিবাহিনী প্রেরণ, বিভিন্ন উপায়ে রাষ্ট্রসংঘ সংঘর্ষ থামানোর ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে। অবশ্য ঠান্ডা যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রসংঘের এই সব প্রয়াস সব সময়ে বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকতো না। ১৯৪০-এর দশকে গ্রীসের গৃহযুদ্ধ চলাকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে গ্রীক কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর ওপর দমন নীতির প্রয়োগ নিয়ে অভিযোগ করলে নিরাপত্তা পরিষদ তা খারিজ করে দেয়। কিন্তু পরবর্তীকালে গ্রীক সরকার পূর্ব ইউরোপেরসমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে গ্রীক কমিউনিস্টদের সাহায্য করার অভিযোগ জানালে রাষ্ট্রসংঘ সেখানে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। কিন্তু এও স্বীকার করতে হয় যে অনেকক্ষেত্রেই রাষ্ট্রসংঘ শান্তির প্রয়াসে, নিরপেক্ষভাবে কাজ করার চেষ্টা করেছে।

১৯৪০-এর দশকে এশিয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলে রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে এই মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঔপনিবেশিক সংঘর্ষ একটি নতুন মাত্রা লাভ করে। এইসব ক্ষেত্রে

সংঘর্ষ রোধ করার চেষ্টায়, রাষ্ট্রসংঘ অবতীর্ণ হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ইন্দোনেশিয়ায়, ডাচ এবং ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বন্ধ করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রসংঘ পদক্ষেপ নেয় এবং রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে ১৯৪৯ সালে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪০-এর দশকে রাষ্ট্রসংঘ কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বন্ধ করার পদক্ষেপ নেয়। ১৯৪৮-৪৯ সালের প্রথম ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ মূলত রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে বন্ধ হয়। ১৯৪৯ সালে কাশ্মীরে রাষ্ট্রসংঘের একটি পর্যবেক্ষণ সমিতিস্থাপিত হয় যা আজো অবস্থিত আছে। এছাড়া ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বন্ধ করার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রসংঘ উদ্যোগী হয়। এছাড়া, প্যালেস্টাইন অঞ্চলে নতুন ইজরায়েল রাষ্ট্র স্থাপনকে কেন্দ্র করে যে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রসংঘ তা মেটাবার উদ্যোগ নেয়। রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে ১৯৪৯ সালে আরব লীগ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি এবং ইজরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ হলেও আঞ্চলিক শান্তি ফেরাতে রাষ্ট্রসংঘ ব্যর্থ হয়। পরবর্তীকালে ১৯৫৬ সালের সুয়েজ যুদ্ধকালে মূলত মার্কিন উদ্যোগে রাষ্ট্রসংঘ শান্তির পক্ষে পদক্ষেপ নিতে শুরুকরে। মিশর এবং ইজরায়েলের সীমান্ত এলাকার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ইউনাইটেড নেশনস এমারজেন্সি ফোর্স (UNEF)-এর হাতে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে সুয়েজ খাঁড়িও পুনরায় খুলে দেওয়া হয়। আরব ইজরায়েল সংঘর্ষ পুনরায় ১৯৬৭ সালে শুরু হয়। রাষ্ট্রসংঘ চেষ্টা করা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত এই যুদ্ধএড়াতে ব্যর্থ হয়। ১৯৭৩ সালে য়োম কিপুর (Yom Kippur) যুদ্ধের পর রাষ্ট্রসংঘ পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে পুনরায় উদ্যোগী হলেও এই উদ্দেশ্য খুব একটা সাফল্য লাভ করেনি।

এশিয়ার অন্যত্র কোরীয় সংঘর্ষ বন্ধ করবার উদ্যোগ অবশ্য সাফল্য লাভ করে। ১৯৫০-৫৪ পর্যন্ত চলা এই যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে বন্ধ হয়। লেবানন এবং সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের মধ্যে ১৯৫৮ সালে সংঘর্ষ রোধে রাষ্ট্রসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৫৯ সালে লাওসে ১৯৭০-এর দশকে সাইপ্রাস সহ বিভিন্ন জায়গায় গৃহযুদ্ধ বা অন্য ধরনের সংঘর্ষ এড়াতে রাষ্ট্রসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও রাষ্ট্রসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৬৭ সালে নাইজেরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু হলে রাষ্ট্রসংঘ তা মেটাতে উদ্যোগী হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮০-র দশকেও নাইজেরিয়ায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বন্ধে রাষ্ট্রসংঘ উদ্যোগ নেয়। এছাড়া অন্যান্য দেশে, যেমন মোজামবিক ও এ্যাঙ্গোলাতেও রাষ্ট্রসংঘ এই ধরনের উদ্যোগ নেয়। এছাড়া দীর্ঘসময় ধরে চলে আসা দক্ষিণ আফ্রিকার এপ্যারথিড (Apartheid) নীতির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘ মূলত 'দক্ষিণ' গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির চাপে কিছু পদক্ষেপ নিলেও পশ্চিম গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির, বিশেষত ব্রিটেনের বিরোধিতায় এই পদক্ষেপ খুব একটা কার্যকরী হয়নি।

সব মিলিয়ে বলা যায় যে, রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে শান্তিরক্ষার প্রয়াস, সাফল্য ও ব্যর্থতার মিশ্র ইতিহাস। রাষ্ট্রসংঘের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৫৪ সালে 'ইউনাইটেড নেশনস হাই-কমিশনার ফর রিফিউজিস' এবং ১৯৬৫ সালে 'ইউনিসেফ' নোবেল শান্তি পুরস্কারলাভ করে। আরো পরে ১৯৮০-এর দশকে রাষ্ট্রসংঘের শান্তিবাহিনী এই পুরস্কার লাভ করে।

এছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রসংঘ বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করেছে। অবশ্য 'উত্তর' গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির চাপে এই পদক্ষেপগুলি খুব একটু কার্যকর হয়ে ওঠেনি।

১৯৮০-র দশকের শেষার্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের দুর্বলতা এবং পতনের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত একমাত্রিক বিশ্বরাজনীতি গড়ে ওঠার প্রবণতা দেখা দেয়। এর ফলে রাষ্ট্রসংঘের কার্যকলাপ আরো সংকুচিত

হয়ে পড়ে। ১৯৮০-র দশকে ইরাক দ্বারা কুয়েত দখলকে কেন্দ্র করে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট যুদ্ধের মাধ্যমে ইরাককে পরাজিত করে সেই দেশেরওপর নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করে। রাষ্ট্রসংঘের সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনরূপে কাজ করার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা এক্ষেত্রে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। অন্যান্য বিষয়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসংঘকে ব্যবহার করার প্রবণতা ভবিষ্যতে বিপজ্জনক হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা রয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের সামনে এক সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। বিভিন্ন ধরনের চাপ ও প্রলোভন উপেক্ষা করে রাষ্ট্রসংঘ যদি নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যেতে পারে তবে বিশ্বরাজনীতিতে এই সংগঠনের গুরুত্ব বজায় থাকবে। নয়ত, লীগের মতনই এই সংগঠনের ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। এছাড়া রাষ্ট্রসংঘের কিছু কাঠামোগত পরিবর্তনও আবশ্যিক। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যের সংখ্যা বাড়াবার জন্যে দীর্ঘ সময় থেকেই বহু মহল আগ্রহী। মহাসচিবের হাতেও অধিকতর ক্ষমতা দেওয়ার কথা কিছু লেখক বলেছেন। কাঠামোগত কোনো পরিবর্তন ছাড়া রাষ্ট্রসংঘের কার্যকলাপের কোনো আশু পরিবর্তন অসম্ভব।

১২.৭ সারাংশ

বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম ধারা হিসেবে আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব যেমন বাস্তব, অপরদিকে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং বিশ্বসংগঠনের মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি এবং সহযোগিতার প্রয়াসও তেমনি সত্যি। ১৯৪৫ সালে রাষ্ট্রসংঘ স্থাপনের মধ্য দিয়ে সেই সহযোগিতার ধারা একটি নতুন মাত্রা পেলেও এর একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্ববর্তী ধারা রয়েছে (যেমন, লীগ অফ নেশনস)।

রাষ্ট্রসংঘের উদ্ভব সম্ভব হয় মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মিত্র-জোটের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে। এই যুদ্ধকালীন সহযোগিতা পরবর্তীকালে পূর্ণতা লাভ করে ১৯৪৫ সালে রাষ্ট্রসংঘ গঠনের মাধ্যমে।

প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি, কাঠামো এবং সাংগঠনিক কার্যকলাপের ভিত্তিতে প্রাক্তন লীগেরসঙ্গেকিছু মিল থাকলেও রাষ্ট্রসংঘ আরো ব্যাপক এবং বিস্তারিত কর্মসূচির সঙ্গে নিজেকে যোগ করেছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন কর্মসূচিতে নতুন মাত্রার সংযোগ ঘটিয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের অন্যতম কাজ হল বিশ্ব শান্তির প্রয়াস। নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যেও রাষ্ট্রসংঘ এই লক্ষে সাফল্য লাভ করেছে।

১৯৯০-এর দশকে রাষ্ট্রসংঘ নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে যার মধ্যে মূল হল মার্কিন নেতৃত্বাধীন একমাত্রিক বিশ্ব গড়ে তোলার প্রচেষ্টা। রাষ্ট্রসংঘকে তার নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হলে এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে।

১২.৮ অনুশীলনী

১. রাষ্ট্রসংঘের সাংগঠনিক কাঠামোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

২. রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে বিশ্বশান্তির প্রয়াসের ওপর একটি টীকা লিখুন। রাষ্ট্রসংঘ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন?

৩. ডামবার্টন ওকস সম্মেলনে কোন কোন প্রতিনিধি দেশ খসড়া পত্র তৈরির দায়িত্ব পায়?

৪. রাষ্ট্রসংঘের প্রথম মহাসচিব কে ছিলেন?

১২.৯ উত্তর সংকেত

১. ১২.৫ অংশটি দেখুন।

২. ১২.৬ অংশটি দেখুন।

৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন এবং চীন।

৪. ট্রিগভি লাই।

১২.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১. পিটার ক্যালভোকোরেসী—'ওয়ার্লড পলিটিকস্ সিনস্ ১৯৪৫' (১৯৬৮)।

২. এইচ. জি. নিকোলাস—'দ্য ইউনাইটেড নেশনস এ্যাজ এ পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশন' (১৯৫৯)।

৩. ইভান লুয়ার্ড—'এ হিস্ট্রি অফ্ দ্য ইউনাইটেড নেশনস্' (১৯৮২)।